(সামাজিক উপন্যাস)

কুল-পুরোহিত, পরাজয়, অভিমান প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

প্রণীত

প্রকাশক

গৃহস্থ পাব্লিসিং হাউস,

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩২৫

মূল্য ২৲ টাকা।

প্রকাশক
শ্রীরামরাখাল ঘোষ
স্বত্বাধিকারী
গৃহস্থ পাবলিসিং হাউস
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা

প্রিণ্টার
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু
ইণ্ডিয়া প্রেস
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা

উপহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাদা মশায়

"খেতা, ওরে খেতা, ও আঁটকুড়ীর পুতনা'

খেতা ওরফে ক্ষেত্রনাথ তখন ফুলগাছের বেড়ার সৌষ্ঠব সাধনে গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিল, সুতরাং দাদা মহাশয়ের চিরাভ্যস্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর তাহার শ্রবণগোচর হইলেও সে তাহাতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না। দাদা মহাশয় তাহার এই উপেক্ষা দর্শনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ওহে নবাবপুত্তুর, গরীবের কথাটা কাণে গেল কি?"

ক্ষেত্রনাথ মুখ না তুলিয়াই উদাসভাবে উত্তর দিল, "কেন?"

দাদা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কি হচ্চে?"

দড়ির ফাঁস টানিতে টানিতে ক্ষেত্রনাথ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "ফুলগাছের বেড়া হচ্চে।"

ক্রুদ্ধস্বরে দাদা মহাশয় বলিলেন, "বেড়া যে হচ্চে তা তো দেখতেই পাচ্চি। কিন্তু বাঁশ দড়ি নষ্ট ক'রে এসকলের দরকার কি?"

ক্ষেত্রনাথ ফাঁস টানিয়া ছুরি দিয়া দড়িটা কাটিয়া লইল; তার পর দাদা মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনার শ্রাদ্ধের সময় তো ফুলের দরকার হবে; তাই দিন থাকতে তার যোগাড় ক'রে রাখছি।"

দাদা মহাশয় তীব্রদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বটে, ভবিষ্যতের ভাবনাটা যে এতদূর ভাবতে শিখেছ, তা' শুনেও বাঁচলাম। আমার শ্রাদ্ধের যোগাড় তো হচ্চে, কিন্তু নিজের পিণ্ডদানের যোগাড়টা কিছু করেছ কি?"

ক্ষেত্রনাথ পুনরায় বেড়ায় দড়ি গলাইতে গলাইতে উত্তর করিল, "সে যোগাড় পিসীমা কচ্চে।"

মুখভঙ্গী করিয়া দাদা মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, পিসীমা পিণ্ডীর যোগাড় কচ্চে, বুড়ো বেটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা আনছে, আর তুমি নবাবপুত্তুর, ইয়ারকি দিয়ে, ফুলগাছের বেড়া বেঁধে আমার চোদ্দ-পুরুষকে কৃতার্থ কচ্চো।"

রুক্ষস্বরে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তবে আবার কি করবো?"

দাদা মহাশয় চড়াগলায় বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ করবে, আমার সাতপুরুষের পিণ্ডী চটকাবে। কেন, বিশ বছরের বুড়ো, নিজের পিণ্ডীর যোগাড়টাও ক'রে নিতে পার না?"

মাথা উঁচু করিয়া ক্ষেত্রনাথ সতেজ কণ্ঠে বলিল, "খু-উ-ব পারি।"

শ্লেষের তীব্র হাসি হাসিয়া দাদা মহাশয় বলিলেন, "সত্যি নাকি? তবে কর না কেন?"

ক্ষেত্র। দরকার হয় না।

দাদা। তা দরকার হবে কেন? দিব্যি বুড়োর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্চ, খেটে খাবার দরকার কি?

ক্ষেত্র। খাওয়াচ্চ কেন?

দাদা। বুঝতে পারি না, পাপের ভোগ। নৈলে আমার সোণার সংসার, ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে কোথায় গেল, শেষে কি না এই বয়সে ভূতের বোঝা ব'য়ে মরি।

ক্ষেত্র। আমি কি ভূতের বোঝা?

দাদা। না, আমার মাথার মণি, সাত পুরুষের গুরুঠাকুর।

ক্ষেত্র। আপনার দেখছি আজকাল বড় চড়া চড়া কথা হ'য়েছে।

দাদা মহাশয় পঞ্চমে চড়িয়া বলিলেন, "অন্যায় হয়েছে, ঝকমারি হয়েছে, তু'ঘা মারবে না কি?"

ক্ষেত্রনাথ বেড়ার বাখারিটা টিপিয়া ধরিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। তীব্রকণ্ঠে দাদা মহাশয় বলিলেন, "তা মার মারবে, এখন বেড়া রেখে, উঠে গরুটা দেখ।"

ঝঙ্কার দিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আমি পারব না।"

দাদা। পারবে না তো খাওয়া হবে কোথা হতে?

ক্ষেত্র। আমি খেতে চাই না।

দাদা। তুমি তো কোন দিনই খেতে চাও না, কিন্তু তোমার পেট তো সে কথা শুনে না।

ক্ষেত্রনাথ ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "নিজের পেটের ভাতের যোগাড় করতে পারি খাব, নয়তো খাব না।"

দাদা মহাশয় বলিলেন, "নিজের পেটের ভাতের যোগাড় করবে? সত্যি?"

ক্ষেত্রনাথ বেড়া ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দাদা মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সতেজ কণ্ঠে বলিল, "হাঁ সত্যি। বেটা ছেলে, হাত পা আছে, কেন আপনার গলগ্রহ হ'য়ে থাকবো?"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে দাদা মহাশয় বলিলেন, "বৈরাগ্য হ'লো বুঝি? গৃহত্যাগী হ'বে নাকি?"

মুখ নীচু করিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আমার আবার ঘর কোথায় দাদা মশায়, যে গৃহত্যাগী হব? আমি যেখানে থাকি সেই আমার ঘর।"

গম্ভীর ভাবে "হুম্" বলিয়া দাদা মহাশয় স্থির দৃষ্টিতে ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; চাহিয়া চাহিয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তা বল্‌বে বৈকি দাদা, পাঁচ বছরেরটী এসেছিলে, সতের বছরের হ'য়েছ। এখন দাদামশায় আর কে? দাদা মশায়ের ঘর এখন পরের ঘর বৈকি।"

দাদা মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া বেড়ার খুঁটিটা নাড়িতে লাগিল। দাদা মহাশয় একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "বেশ, স্বচ্ছন্দে যাও, যেখানে গেলে সুখী হও, সেই খানেই যেতে পার। মনে ক'রো না, তুমি চলে গেলে দাদা মশায়ের বড় লাগবে। একটুও লাগবে না হে, একটুও লাগবে না। কেন, কি জন্য লাগবে? পরের ছেলে বৈ তো নয়। নিজের সোণার সংসার কোথায় ভেসে গেল, বুক ধ'রে তা সয়ে আছি, আর তুমি গেলে সইতে পারবো না? স্বচ্ছন্দে যাও। আমি বরং তোমাদের হাত হ'তে অব্যাহতি পেলে বেঁচে যাই। আমার আর কি; কেন আর এ গাধার বোঝা বওয়া? আমার এখন এসব ছেড়ে

বিশ্বেশ্বরের পায়ে মাথা রাখবার সময়, এসময়ে কেন আর এ কর্ম্মভোগ !"

দাদামহাশয়ের গলার স্বরটা ক্রমেই ভারি হইয়া আসিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বিশ্বনাথের উদ্দেশে বলিলেন "বিশ্বনাথ, এই সব নিমকহারামদের হাত হ'তে আমায় অব্যাহতি দাও ঠাকুর !"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিয়া দাদামহাশয় দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। ক্ষেত্রনাথ বেড়াটা ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ; তার পর দাদামহাশয় অদৃশ্য হইলে পুনরায় বৃতিবন্ধন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের ছেলে

বুড়া রামতারণ ঘোষাল লোক যে নিতান্ত মন্দ ছিলেন তাহা নহে। লোকের আপদে বিপদে দেখা শোনা, টাকাকড়ি দিয়া সাহায্য করা, গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইয়া দেওয়া, প্রভৃতি কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। এজন্য গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল। শুধু দোষের মধ্যে তাঁহার মেজাজটা একটু চড়া, মুখটা একটু দরাজ ছিল। তাঁহার মুখের কথা শুনিলে কেহই বুঝিতে পারিত না যে, এই রুক্ষ-প্রকৃতি বুড়া লোকটার ভিতর মানবোচিত কোমলতা দয়ামায়ার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব আছে। ইহার উপর যে দিন সাধ্বী সহধর্ম্মিণী এবং উপযুক্ত পুত্র ভবতারণ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া অনন্ত রাজ্যে চলিয়া গেল, সেই দিন হইতে তাঁহার চড়া মেজাজটা যেন আরও বেশী চড়িয়া উঠিল; ভাল কথা বলিয়াও লোকে তাঁহার মুখে কর্কশ কথা ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইত না। লোকে ভাবিত, শোকে দুঃখে বুড়ার মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে। কেহ বা বলিত, "বুড়া ক্ষেপিয়াছে, শীঘ্রই উহার পায়ে বেড়ী দিতে হইবে।"

কিন্তু বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি বুড়া রামতারণ ঘোষালের ক্ষেপিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুতরাং তাঁহার পায়ে বেড়ী দিবারও কোন প্রয়োজন হইল না। সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল। শুধু রামতারণ ঘোষাল পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সত্তর বৎসরের বুড়া সাজিলেন। তাঁহার মাথার চুলগুলা

সাদা হইয়া গেল, ললাটের মাংস কুঞ্চিত হইল, দীর্ঘ দেহ প্রচণ্ড ঝটিকাহত বনস্পতির ন্যায় বাঁকিয়া পড়িল। বৃদ্ধ পত্নীপুত্রের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে যেন পাঁচ বৎসরে পঁচিশ বৎসর আয়ুষ্কাল তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। সংসার তাঁহার এই ব্যগ্রতা দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

নগদ সম্পত্তি তেমন বেশী ছিল না, কিন্তু জমিজমা যথেষ্ট ছিল। লাখরাজে জমায় প্রায় দুই শত বিঘা জমি। আগে জমির কতক প্রজা বিলী ছিল, কতক নিজ জোতে চাষ আবাদ হইত। চাষের জন্য চার খানা লাঙ্গল, চার জোড়া বলদ, পাঁচটা কৃষাণ ছিল। চাষের সময় কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিত না। তারপর পৌষ মাসে যখন স্বর্ণবর্ণ ধান্যের রাশিতে থামার আলো হইত, ছয় সাতটা বড় বড় গোলা ধানে ভরিয়া যাইত, তখন ঘোষাল মহাশয় ঘটা করিয়া কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া দিতেন। দুই তিনটা গোলার ধানেই সংবৎসরের খরচ চলিত, বাকী ধান খাতকদের দেড়া সুদে 'বাড়ী' দেওয়া হইত।

বৃদ্ধের এই সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল পুত্র ভবতারণ। সেই ভবতারণ যখন চলিয়া গেল, তখন ঘোষাল মহাশয় একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর এত ঝঞ্ঝাট ভাল লাগিল না; জমি সব প্রজাবিলি করিয়া দিলেন, গরুগুলা বেচিয়া ফেলিলেন, ধান কর্জ্জ দেওয়ার কারবারও সঙ্কুচিত করিয়া আনিলেন। কেবল যাহাদের নিতান্ত না দিলে নয়, তাহাদিগকেই কিছু কিছু ধার কর্জ্জ দিতে লাগিলেন। আর সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া দামোদরের সেবা ও হরিনাম লইয়া শেষের দিন কবে আসিবে সাগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষায় সংসারে বসিয়া রহিলেন।

সংসারে ছিলই বা কে? ছিল শুধু বিধবা পুত্রবধূ রমা; আর রমারই মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেত্রনাথ।

রমা যে বৎসর বিধবা হইল, সেই বৎসরই তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ পাঁচ বৎসরের ছেলে ক্ষেত্রনাথকে রাখিয়া মারা গেল। রমা ভাই ভাজের জন্য কাঁদাকাটা করিল, তারপর লোক পাঠাইয়া অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কাছে আনিল। ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটাকে আবার আনলে কেন বৌমা?"

রমা সসঙ্কোচে বলিল, "ওকে দেখবার কেউ নাই, বাবা।"

বিরক্তভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কেউ নাই ব'লে আমার ঘাড়ে চেপে বসবেন বুঝি? তা হবে না বৌমা, আমি আর ও সব হাঙ্গামা পোয়াতে পারবো না।"

রমা চুপ করিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় রুক্ষস্বরে বলিলেন, "না না বৌমা, ও সব হাঙ্গামা আর জুটিও না, মিছে কেন ভূতের বোঝা বওয়া?"

শোকজড়িত কণ্ঠে রমা বলিল, "আজ যদি আমার সেই এক বছরের ছেলেটা থাকতো?"

গাঢ়স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "থাকতো—থাকতো, নাই যখন তখন আর কি হবে? তাই ব'লে কি একটা পরের ছেলের ভার নিয়ে ভূতের বোঝা বইতে হবে? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না বৌমা।"

রমা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ওসব মিছে মায়া বাড়িয়ে কাজ নাই, যেখানকার ছেলে সেইখানে পাঠিয়ে দাও।"

রমা মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা।"

দিন পাঁচ সাত পরে একদিন ঘোষাল মহাশয় রমাকে ডাকিয়া

বলিলেন, "শুনেছ বৌমা, ছোড়া আমাকে আবার দাদা মশায় ব'লে ডাকে।"

রমা কোন উত্তর দিল না। ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বৌমা, আমি যে সম্পর্কে ওর দাদামশায় হই, কে ওকে তা শিখিয়ে দিলে? তুমি ব'লে দিয়েছ কি?"

রমা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "কৈ, না।"

ঘোষাল মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "এই দেখ, তবু তো ও ঠিক সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে। ছেলে কি না, ওদের হৃদয়ে যে নারায়ণ বাস করেন। ছোঁড়াটা বেশ চালাক চতুর দেখছি, কথাগুলিও বেশ মিষ্টি।"

রমা বলিল, "ও কা'ল চ'লে যাবে।"

বিস্মিতকণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "চলে যাবে? কোথায় যাবে?"

রমা। কলকাতায় ওর মায়ের এক পিসতুতো বোন আছে, তার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ঘোষা। পাঠিয়ে দেবে? কেন, এখানে রাখলে কি তোমার অসুবিধা হ'তো?

রমা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তা দেখ বাবু, যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তবে আমি বলি কি, ছেলেটাকে রেখে দিলে ভাল হ'তো না কি? তোমারও তো—"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঈষৎ গাঢ়স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তোমারও তো একটা মন-আবরণ চাই। তা দেখ, তোমার ভাইপো, আমি আর কি বলবো।"

ঘোষাল মহাশয় একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রমা মনে মনে

হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা দেখি। তবে তাদের খবর পাঠিয়েছি।"

ঘোষাল মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "খবর পাঠিয়েছ, লোক পাঠিয়ে বারণ ক'রে দিলেই হ'লো। তা দেখ, আমি তোমার জন্যই বল'ছ। নৈলে আমার আর কি, আমি তো শেষ খেয়ায় পা বাড়িয়ে ব'সে আছি।"

রমা বলিল, "থাকে না হয় থাক্।"

ঘোষাল মহাশয় সোৎসাহে বলিলেন, "আমিও তাই বলছি, থাকে থাক্, কি বল? কে কা'কে খাওয়ায় বৌমা, যে খাওয়াবার মালিক সেই খাওয়াবে। ওর বরাতে যদি আমার ঘরের অন্নজল লেখা থাকে, তবে তুমিও তা খণ্ডাতে পারবে না, আমিও পারব না। তবে পরের ছেলে এই যা বল। তা কে কার পর, কে কার আপনার বৌমা? এই যে আপনার যা ছিল—যাক্, দামোদর, দীনবন্ধু, তোমারই ইচ্ছা!"

ঘোষাল মহাশয় যখন দামোদরের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিলেন, তখন তদীয় ইচ্ছাক্রমেই অনাথ বালক ক্ষেত্রনাথ, ঘোষাল মহাশয়ের অন্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। রমা তাহাকে দিয়া আপনার অপত্যহীন হৃদয়ের সকল ক্ষোভ মিটাইয়া লইতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয়ও যে তাহাকে ভালবাসিতেন না এমন নহে, কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া সে ভালবাসার গভীরতা পরিমাণ করিবার উপায় ছিল না। খেতুর আব-দারে অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কখন তিনি রাগে বাড়ী মাথায় করিতেন; বধূকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "এসব আর আমার ভাল লাগে না বৌমা, কোথা হ'তে একটা হতভাগা লক্ষীছাড়া ছেলে এনে বুড়োকে শাসন করতে বসেছ? দূর ক'রে দাও, ওসব আপদ্ দূর ক'রে দাও।"

আবার কখন রমা যদি খেতুকে গালাগালি বা প্রহার দিত, তবে

তিনি ছুটিয়া আসিয়া বলিতেন, "আহা, ছেলেটাকে মারলে বৌমা, তোমার মনে কি একটু মায়া মমতা নাই? ওর মুখের দিকে চাইতে আর কে আছে? ওকে গাল দিচ্ছ, কিন্তু ও গেলে সংসারে আর থাকবে কি বৌমা, সংসারটা যে শ্মশান হ'য়ে যাবে!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিত।

ঘোষাল মহাশয় খেতুকে পাঠশালায় দিলেন। খেতুর কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ছুটাছুটি ছাড়িয়া পাঠশালায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আদৌ ভাল লাগিত না; আম জামের আস্বাদের পরিবর্ত্তে বর্ণপরিচয়ের আস্বাদ তাহার নিকট বড়ই বিস্বাদ বোধ হইত। সুতরাং তাহাকে প্রায়ই গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কঠোর স্বাদ অনুভব করিতে হইত। একদিন তাহার অঙ্গে অতিরিক্ত প্রহারচিহ্ন দর্শনে ঘোষাল মহাশয় রাগিয়া উঠিলেন, এবং গুরুমহাশয়কে গালাগালি দিয়া খেতুকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। রমা প্রতিবাদ করিলে বলিলেন, "মার খেয়ে যদি ছেলেটা মরেই যাবে, তবে লেখা পড়া শিখে ফল হবে কি? রেখে দাও তোমার লেখাপড়া, ও যদি চাষবাস ক'রে খেতে পারে, তবে ওর অন্ন খায় কে? হিসেব নিকেশ, সে সব আমিই শিখিয়ে দেব।"

ঘোষাল মহাশয় দিন কতক খেতুকে লইয়া শিক্ষা দিতে বসিলেন। কিন্তু খেতুর অমনোযোগিতায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না না, তোর কিছু হবে না।" তারপর রমাকে ডাকিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "ও ছোঁড়ার কিছু হবে না বৌমা, ওর বাবা ছিল আকাট মুখ্যু, ওর কি কিছু হয়? কেন পণ্ডশ্রম ক'রে মরি, ততক্ষণ হরিনাম করলে কাজ হবে।"

ঘোষাল মহাশয় হরিনাম লইয়া ব্যস্ত রহিলেন, আর ক্ষেত্রনাথ মাছ ধরিয়া, দাণ্ডাগুলি খেলিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে লাগিল।

রমা কিন্তু ছাড়িল না, সে ক্ষেত্রনাথের স্বচ্ছন্দতায় বাধা দিয়া তাহাকে পুনরায় পাঠশালায় পাঠাইয়া দিল। এমনি করিয়া কিছু দিন পাঠশালায়, কিছু দিন স্কুলে ঘুরিয়া প্রবেশিকার শ্রেণী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ক্ষেত্রনাথ সরস্বতীর সহিত সম্পূর্ণ সংস্রব ত্যাগ করিল, এবং মৎস্য শিকার, পক্ষী প্রতিপালন, পুষ্পোদ্যান রচনা প্রভৃতি কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোমলে কঠোরে

ঘোষাল মহাশয় বাড়ী ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "বৌমা !"

শ্বশুরের উগ্রকণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া রমা তাড়াতাড়ি রন্ধনশালার বাহিরে আসিল; উত্তর দিল, "কেন বাবা ?"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কেন বাবা ? আচ্ছা বৌমা, এই বুড়োর উপর তোমাদের এত অত্যাচার কেন বল দেখি ?"

রমা কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বুড়োটা যে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মরবে, এটাও কি তোমাদের সহ্য হয় না ?"

শঙ্কিত স্বরে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে বাবা ?"

উচ্চকণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হ'য়েছে আমার মাথা মুণ্ডু শ্রাদ্ধ। আমি তখনই বারণ ক'রেছিলাম, ও সব ভূতের বোঝা আর ঘাড়ে চাপিও না বৌমা। তাতো শুনলে না, কোথাকার এক পরের বোঝা এনে বুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে।"

এতক্ষণে রমা ব্যাপারটা যেন কতক বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বুঝেছি বাবা, খেতা বুঝি—"

বাধা দিয়া ঘোষাল মহাশয় তীব্রস্বরে বলিলেন, "হাঁ গো হাঁ, খেতা, তোমার আদরের ভাইপো ক্ষেত্রনাথ। আচ্ছা বৌমা, আমি তোমাদের কাছে এমন কি অপরাধ ক'রেছি যে, একটা পরের ছেলেকে দিয়ে এই বয়সে আমাকে এমন হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে মারচো ?"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘোষাল মহাশয় কাপড় ছাড়িয়া পা ধুইতে বসিলেন। রমা আপন মনে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হতভাগা ছেলে বড্ড বাড় বেড়েছে, আসুক আজ ঘরে।"

খড়ম পায়ে দিয়া ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এলে আর করবে কি? দু'টো গাল দিয়ে ভাত বেড়ে দেবে। সে চালাক ছেলে, গালটা বাদ বেখে ভাতগুলি পেটে দিয়ে আপনার পথ দেখবে। এই তো?"

"ভাত দেব, না খেংরা দেব" বলিয়া রমা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। ঘোষাল মহাশয় ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে ঠাকুরের উদ্দেশে ব'ললেন, "পূর্ব্বজন্মে কত পাপ ক'রেছিলাম, সে পাপের কি এখনো শেষ হয় নাই ঠাকুর? আর কেন দামোদর, বুড়াকে এবার মুক্তি দাও।"

বৃদ্ধের বেদনাহত হৃদয়ের গভীর দীর্ঘশ্বাস সশব্দে দামোদরের পায়ে আছাড়িয়া পড়িল।

একটু পরে ক্ষেত্রনাথ আসিয়া পিসামাকে ডাকিয়া বলিল, "ভাত হ'য়েছে পিসামা?"

পিসীমার কাছ হইতে কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ রন্ধনশালার দরজায় গিয়া দাঁড়াইল, এবং ভিতরে উঁকি দিয়া বলিল, "শুনতে পাচ্ছনা পিসীমা?"

রমা তাহার দিকে না ফিরিয়াই গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "না।"

ক্ষেত্র। কেন, হ'য়েছে কি?

রমা। আমার ছাদ্দ।

ক্ষেত্রনাথ মৃদু হাসিল। রমা তাহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া চড়া গলায় বলিল, "দিন দিন তুই এত বেড়ে উঠছিস্ কেন বল্ দেখি?"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "তা পিসীমা, বয়স হচ্চে, আর এক আধটু বাড়বো না? চিরকাল কি ছেলে মানুষটীই থাকবো?"

গর্জ্জন করিয়া রমা বলিল, "বটে, তোর বাড় আমি ঘুচিয়ে দিচ্চি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তা ঘুচিও পরে, এখন ভাত হ'য়ে থাকে তো দাও। ক্ষিদে পেয়েছে।"

রমা বলিল, "ক্ষিদে তো পেয়েছে, কিন্তু তুই বাবাকে আজ কি ব'লেছিস্?"

ক্ষেত্রনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এই কথা! ও বুড়োর ভীমরথী হ'য়েছে পিসীমা।"

রমা রাগে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "খেতা!"

ক্ষেত্রনাথ এবার মুখ ভার করিয়া বলিল, "দেখ, ক্ষিদের সময় এসব রাগ তাপ ভাল লাগে না। আগে ভাত দাও।"

রমা বলিল, "দেব না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "বা রে, ভাত দেবে না তো খাব কি?"

রমা সগর্জ্জনে বলিল, "ছাই।"

ক্ষেত্রনাথ রাগিয়া বলিল, "বোয়ে গেছে আমার ছাই খেতে, ছাই খাবে তোমার বাবা।"

রমা বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "বেরো হতভাগা বাড়ী হ'তে, ঝাঁটায় মুখ ভেঙ্গে দেব তা জানিস্।"

পিসীমার রাগ ক্ষেত্রনাথের অপরিচিত নহে, কিন্তু আজিকার মত

রাগ সে একদিনও দেখে নাই। একে ক্ষুধার তাড়না, তাহার উপর পিসীমার কটূক্তি, সুতরাং ক্ষেত্রনাথ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; রাগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমরা কি মনে কর আমার হাত পা নাই, আমি প'ড়ে প'ড়ে তোমাদের ঝাঁটা খাব?"

রমা বলিল, "না খাস্, দূর হ'য়ে যা, চুলোয় যা।"

"আচ্ছা, তাই যাব" বলিয়া ক্ষেত্রনাথ দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ঘোষাল মহাশয় ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেতা কোথায় গেল বৌমা?"

রমা রন্ধনশালা হইতে ভারী গলায় উত্তর দিল, "চুলোয়।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "চুলোয় তো সকলেই গেছে বৌমা, বাকী আছি কেবল আমি। আগে আমি সেখানে যাই, তারপর যার যেতে হয় সে যাবে।"

রমা কোন উত্তর করিল না। ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এই ঠিক দুকুর বেলা ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে তাড়ালে বৌমা? তোমার কি একটু মায়া মমতা নাই? তোমার বুক কি পাষাণে গড়া?"

ঘোষাল মহাশয় যদি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, রমার বুক পাষাণে গড়া নহে; রমা তখন চোখে আঁচল চাপা দিয়াছে।

রমা কোন কথা বলিল না, কথা বলিবার ক্ষমতাও তাহার তখন ছিল না, পুঞ্জীভূত অশ্রু কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছিল। বধূকে নিরুত্তর দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষাদক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "দামোদর! এ সব যন্ত্রণা হ'তে বুড়াকে অব্যাহতি দাও, ঠাকুর।"

তিনি পুনরায় ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া পূজায় বসিলেন। অনেকক্ষণ পরে পূজা শেষ হইল। রমা ডাকিল, "ভাত বাড়া হ'য়েছে, বাবা!"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এখন তুলে রাখ। ছেলেটা না খেয়ে চ'লে গেল, আর আমি বুড়ো, কোন্ লজ্জায় মুখে ভাতের গ্রাস তুলবো বৌমা?"

চটী জুতা পায়ে দিয়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া ঘোষাল মহাশয় বাহির হইয়া গেলেন। রমা রন্ধনশালার দরজায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিমির রাগ

"কোথায় যাচ্চ দাদামশাই ?"

"চুলোয়।"

"এদিকে কি চুলোর রাস্তা ?"

"রাস্তাটা ভুলে গেছি নিমি, কোন্ দিকে বলে দিতে পারিস্ ?"

নিমি বলিল, "পারি। তুমি তোমাদের খেতাকে খুঁজতে যাচ্চ তো ?"

সহাস্যে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "খুঁজতে যাচ্চি না, কোন্ দিকে গেল তাই দেখ্‌ছি। এদিকে আসতে দেখেছিস্ ?"

নিমি ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "হুঁ:।"

ঘো। কোন্ দিকে গেল বল্ দেখি ?

নি। কোন্ দিকে যাবে আবার, ভাত খেতে ব'সেছে।

ঘো। ভাত খেতে ব'সেছে ?

একটু রাগতস্বরে নিমি বলিল, "হঁা। আচ্ছা দাদামশাই, তোমাদের খেতুর কি আক্কেল! ঠিক দুকুর বেলা এসে বলে কি না, ভাত আছে রে নিমি ?"

মৃদু হাসিয়া ঘোষাল মাহাশয় বলিলেন, "ও ছোঁড়ার একটুও আক্কেল নাই নিমি। তার পর ?"

নিমি বলিল, "তার পর আর কি, মাকে তো জান, তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিলে, আর সে খেতে ব'সে গেল।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বটে !"

নিমি হাত নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা দাদামশাই, আমরা গরীব লোক, মা কত কষ্টে দু'জনের ভাতের যোগাড় করে। তার উপর ও কোন্ লজ্জায় এসে ভাত চায়?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ওর কি লজ্জা আছে নিমু, তা হ'লে এসে তোর ভাতে ভাগ বসায়?"

নিমি বলিল, "আমার ভাতে ভাগ বসাবে কেন, মা কি আমার ভাত ওকে দেবে, নিজের ভাতগুলি ধ'রে দিয়েছে। তারপর মা সারা দিন রাতটা হয় তো উপোস দিয়ে কাটাবে। আচ্ছা দাদামশাই, এ রকম উপোস দিলে মা ক'দিন বাঁচবে?"

নিমির চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল; সে হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিল। বাড়ীর ভিতর হইতে মা ডাকিল, "নিমি!"

নিমি পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "যাই মা।"

ঘোষাল মহাশয় ব্যস্তভাবে বলিলেন, "দেখ নিমি, আমি যে খুঁজতে এসেছিলাম, তা ওকে বলিস্ না, বুঝলি।"

ঘোষাল মহাশয় দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, নিমি বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সঙ্গে কথা কইছিলি?"

নিমি বলিল, "কার সঙ্গে আবার, ও পাড়ার দাদামশয়ের সঙ্গে।"

খেতু তখন আহার শেষ করিয়া জল খাইতেছিল। জলের ঘটীটা নামাইয়া রাখিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হুঁ হুঁ, দাদামশায় বুঝি এরি মধ্যে খুঁজতে বেরিয়েছে?"

নিমিও ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "হাঁ, খুঁজতে বৈ কি, তুমি কোন্ দিকে গিয়েছ তাই জানতে।"

খেতু হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওহো, খুঁজতে আসেনি, কোথায় গিয়েছি তাই জানতে এসেছে!"

নিমি তর্জ্জনী আঙ্গুলটা উদ্যত করিয়া সরোষে বলিল, "আমি কিন্তু তোমার গুণের কথা সব বলে দিয়েছি।"

মাথা নাড়িয়া খেতু বলিল, "আমার আবার কি গুণের কথা তুই বলবি রে নিমি?"

নিমি বলিল, "কি গুণ? দুকুর বেলা কেন আমাদের ভাতে ভাগ পাড়তে এসেছ?"

নিমির মা তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তবে রে আবাগী, তোর ভাগ তো খেতে যায় নি?"

নিমি বলিল, "তোমার ভাগ তো খেয়েছে!"

নিমির মা বলিলেন, "খেয়েছে বেশ করেছে। তাতে তোর গায়ের জ্বালা কেন লা পোড়ার মুখী।"

সহাস্য তিরস্কারের স্বরে খেতু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কেমন!"

খেতু হাত মুখ ধুইয়া চলিয়া গেল, নিমি খুঁটী জড়াইয়া ধরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নিমির পূরা নাম নির্ম্মলা, কিন্তু সকলেই তাহাকে নিমি বলিয়াই ডাকিত। বাপ ছিল না, শুধু মা ছিল। অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল না। বাপ দীননাথ চক্রবর্ত্তী যখন মারা যান, তখন দুই তিনশত টাকা দেনা ছিল। দেনার দায়ে জমি জায়গা যা ছিল সব গেল, শুধু ব্রহ্মোত্তর বাস্ত ভিটাটুকু রহিল। নিমির মা মেয়েটীকে লইয়া স্বামীর ভিটা জড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন। গ্রামে কয়েক ঘর যজমান ছিল, জ্ঞাতি দেবর বলরাম চক্রবর্ত্তী তাহাদের পৌরোহিত্য করিতে লাগিল। সে দয়া

করিয়া প্রাপ্যের যে সামান্য অংশ দিত তাহাতেই কষ্টে সংসার চলিত। তদ্ব্যতীত প্রয়োজন হইলে প্রতিবাসীদের কাহারও ঘরে রাঁধিয়া দিয়া, কাহারও মুড়ী ভাজিয়া বিধবা আপনার ও কন্যার পেট চালাইতেন।

তারপর নিমি যখন নয় বৎসরে পড়িল, তখন অনেকে পরামর্শ দিল, "নিমির মা, তোমাদের তো বেচা কেনার ঘর, মেয়েটাকে বেচে কিছু হাত ক'রে নাও।"

খরিদ্দারও জুটিল। গ্রামের মদন আকুলি পঞ্চাশ বৎসরে বিপত্নীক হইয়া নগদ চারিশত টাকা মূল্যে নিমিকে ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইল, এবং নিমির মার যাবজ্জীবন প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিতেও প্রতিশ্রুত হইল। নিমির মা কিন্তু ইহাতে রাজি হইলেন না। স্বামী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, "বড় বৌ, খেতে না পেলেও মেয়েটাকে বিক্রী ক'রো না, একটী হরিতকী দিয়ে সুপাত্রের হাতে দান করবে।" নিমির মা কষ্টে পড়িলেও স্বামীর মৃত্যুকালীন আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। অগত্যা মদন আকুলি সাড়ে তিনশত টাকা পণ দিয়া একটী সাত বৎসরের নব বধূ ঘরে আনিল। লোকে নিমির মাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

নিমি ক্রমে দশ ছাড়াইয়া এগারোয় পা দিল। তাহার জ্ঞাতি কাকা বলরাম চক্রবর্ত্তী আসিয়া নিমির মাকে বলিল, "বড় বৌ, মেয়ে বড় হ'য়ে উঠছে, বিয়ে দাও।"

নিমির মা বলিলেন, "বিয়ে দেবার মালিক তোমরাই তো ঠাকুরপো, তোমরা চেষ্টা না করলে আমি মেয়ে মানুষ কি করবো।"

বলরাম বলিল, "চেষ্টা আমরা দেখতে পারি, কিন্তু পয়সার মালিক তো তুমি। ভাল ছেলে দেখে দিতে গেলে চার পাঁচশো টাকা চাই। দিতে পারবে?"

ম্লানমুখে নিমির মা বলিলেন, "আমি খেতে পাই না, টাকা কোথায় পাব ঠাকুরপো ?"

বলরাম বলিল, "সেই জন্যই তো বিক্রী করতে পরামর্শ দিয়েছিলাম।"

নিমির মা দৃঢ়স্বরে বলিল, "প্রাণ থাকতে আমি মেয়ে বেচতে পারবো না।"

"তবে যা হয় কর" বলিয়া বলরাম নিরস্ত হইল। নিমির বিবাহের কোন চেষ্টাই হইল না। সে পাড়ায় পাড়ায় খেলিয়া গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিমির মা ভাবিল, "থাক্, যেদিন বিয়ের ফুল ফুটবে সেদিন আপনা হ'তেই হ'য়ে যাবে।"

নিমি মেয়েটী ভাল, দোষের মধ্যে তাহার রংটা একটু ময়লা সুতরাং রামধন ঘটক দুই একটা সম্বন্ধ আনিলেও চারিশত টাকার কমে কেহ এই কালো মেয়েটীকে ঘরে লইতে রাজি হইল না। নিমির মা স্বামীর ভিটাটুকু বেচিয়া বড় জোর একশত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কিন্তু চারিশত টাকা তাঁহার পক্ষে আকাশ-কুসুম ছিল দেখিয়া শুনিয়া নিমির মা হতাশ হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, স্বামীর অন্তিম আদেশ লঙ্ঘন করিয়া শেষে বুঝি মেয়েটাকে বেচিতেই হইবে। লোকেও পাঁচ কথা বলিয়া তাঁহাকে আরও নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

শুধু খেতু আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিত, "ভয় কি মাসীমা, নিমির বিয়ে—তার জন্যে তোমার ভাবনা কি ?"

খেতুর কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলেও নিমির মা যেন এই আশ্বাসবাণীর মধ্যে একটু আশার আলোক দেখিতে পাইতেন।

নিমির সঙ্গে তেমন বনিবনাও না থাকিলেও নিমির মার সঙ্গে

খেতুর এমন একটা স্নেহ-সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, নিমির মা খেতুকে আপনার গর্ভজাত সন্তান হইতে বিভিন্ন চক্ষে দেখিতেন না, খেতুও এই পাতানো সম্পর্ক মাসীমার কাছে এমন সব আবদার উপদ্রব করিত, যাহা সে পিসীমার কাছে করিতে পারিত না। ইহাতে নিমির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে খেতুর ঝগড়া বাধিত। নিমির মা সে ঝগড়া দেখিয়া কখন হাসিতেন, কখন মেয়েকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিতেন। সুতরাং বিবাদে খেতুরই জয় হইত। অনেকেই ভাবিত, খেতুর সহিত বোধ হয় নিমির বিবাহ হইবে।

কিন্তু নিমি বারো বছরে পড়িলেও যখন কোন পক্ষ হইতেই এ বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল না, তখন লোকে বলাবলি করিল, "মাগীর একটা কিছু মতলব আছে।"

বলরাম বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মতলব আর কি, মেয়ে বড় ক'রে টাকার মোটটা ভারী করবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশা

ঘোষাল মহাশয় আহার করিতে বসিয়াছিলেন, রমা মাথার কাপড়টা কপালের উপর পর্যন্ত টানিয়া দিয়া অদূরে বসিয়াছিল। আহার করিতে করিতে ঘোষালমহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা বৌমা, এক কাজ করলে হয় না?"

রমা উত্তর করিল, "কি কাজ বাবা?"

"ছোড়াটার বয়স কত হলো?"

"সতের আঠার বছর হবে।"

"আঠার বছর! তা এমন কম বয়সই বা কি।"

রমা একটু কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। কতকগুলা ভাত কোলের দিকে টানিয়া তাহাতে ডাল মাখিতে মাখিতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি বলি কি, ওর একটা বিয়ে দেওয়া যাক্। তুমি কি বল?"

রমা নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "তা দিলেই হয়। তবে এত তাড়াতাড়ি কেন?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তাড়াতাড়ি আর কি, আমি কি আজই দিতে বলছি। ঘর না চেষ্টা চরিত্তির করা, পাঁচ জায়গায় দেখা শোনা, এ করতেও কোন্ না পাঁচ সাত মাস কাটবে।"

রমা নিরুত্তরে নতমুখে আঙ্গুল দিয়া মাটীতে দাগ কাটিতে লাগিল উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করিয়া ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মত কি?"

রমা মৃদুস্বরে বলিল, "মত অমত এমন কি, তবে দু' এক বছর গেলে ভাল হ'তো।"

পাথরবাটীর অম্বলটা ভাতে ঢালিয়া ব্যস্তহস্তে তাহা মাখিতে মাখিতে ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, ভাল যদি হয়, তবে তাই হবে। দু' বছর—তা যাক্ না দু' চার বছর। তবে বাছা এটাও মনে ক'রো না যে, বুড়ো সংসারে মৌরসী পাট্টা নিয়ে এসেছে।"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘোষাল মহাশয় ক্ষিপ্রহস্তে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিলেন। রমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা বাবা, আমারও ইচ্ছে, ছোঁড়ার বিয়ে দিয়ে একটা পরের মেয়ে ঘরে আনি, আমারও একটা হাতের দোসর হোক।"

ভাতের থালা হ'তে মুখ তুলিয়া ঘোষাল মহাশয় ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমিও তো সেই কথাই বলছি। ধর না বৌমা, আমিই না হয় বুড়ো হ'য়েছি, সাধ আহ্লাদ কিছু নাই; কিন্তু তোমার যে কোন সাধই মেটে নি। নিজের—" ঘোষাল মহাশয়ের স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল; তিনি একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নিজের—সে সব তো ফুরিয়ে গিয়েছে। একটা পরের ছেলে, মানুষ ক'রেছ। এখন সাধ বল, আহ্লাদ বল, সকলই তো তাকে নিয়ে।"

মুখ নীচু করিয়া রমা বলিল, "তা বটে বাবা, কিন্তু ও ছোঁড়া তো মানুষ হ'লো না। ওর যে রকম ভাব গতিক দেখছি, তাতে একটা পরের মেয়েকে ওর গলায় দিয়ে শেষটা—"

বক্তব্যের অসমাপ্ত অংশের প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "শেষটা পস্তাতে হবে, তাকে ভাত কাপড় দিতে পারবে না, এই তো? পারবে না কেন? যেমন হোক দু' পাত ইংরিজী পড়েছে;

কলকাতায় গেলে কোন্ না বিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা চাকরী করতে পারবে ? আর চাকরীই বা—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই ঘোষাল মহাশয় বধূর দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা বৌমা, তোমরা ঠাউরেছ কি ? আমি কি জমি জায়গাগুলা সঙ্গে নিয়ে যাব, না ভূতো বাগ্দীকে দানপত্র ক'রে দিয়ে যাব ?"

ঘোষাল মহাশয় আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আচমন করিলেন, রমা পান ছেঁচিয়া আনিয়া দিল। ঘোষাল মহাশয় তাহা না লইয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন। রমা আপন মনে মৃদু হাসিল।

রমাও কিছুদিন হইতে ঠিক এই কথাটাই ভাবিতেছিল, কিন্তু শ্বশুরের কাছে কথাটা পাড়িতে সাহস করে নাই। হাজার হউক পরের ছেলে, বিশেষতঃ তাহার ভাইপো, শ্বশুর যে অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাকে এতকাল প্রতিপালন করিতেছেন ইহাই যথেষ্ট। ইহার উপর তাহার বিবাহের জন্য ব্যগ্রতা দেখাইলে যদি শ্বশুর কিছু মনে করেন, এই ভয়েই রমা শ্বশুরের কাছে প্রস্তাবটা করিতে পারে নাই। তারপর শ্বশুর নিজেই যখন কথাটা পাড়িলেন, তখনও সে তাহাতে আগ্রহ দেখাইতে যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। তবে সে ইহাও জানিত, শ্বশুরের মনে যখন কথাটা উঠিয়াছে, তখন তিনি কাজটা শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না ; এজন্য তাহার মতামতে কিছু যায় আসে না।

ঘোষাল মহাশয় কিন্তু সেদিন বধূর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিলেন না ; থাকিয়া থাকিয়া শুধু গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত দুস্তর ভবসাগর পার করিবার জন্য পারের কাণ্ডারীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

পরদিন রমা শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবা, কোথাও মেয়ে টেয়ে দেখচো নাকি ?"

মৃদু হাসিতে গভীর ঔদাস্য ব্যক্ত করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কেন বল দেখি? আর তো তোমার নতুন শাশুড়ী পাবার সময় নাই বৌমা?"

রমা সহাস্যে বলিল, "শাশুড়ী পাবার সময় না থাকলেও শাশুড়ী হ'বার সময় তো আছে?"

ঘোষাল মহাশয় সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

দুই তিন দিন পরে ঘোষাল মহাশয় বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি না একটী মেয়ে খুঁজছিলে বৌমা?"

রমা মৃদু হাসিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আছে একটী মেয়ে, বেশী দূরে নয়, গাংপুরে।"

রমা বলিল, "দেখতে শুনতে ভাল তো?"

ঘাড় নাড়িয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "খুব যে ভাল, পরমা সুন্দরী, এমন কথা বলতে পারি না, তবে গেরস্ত ঘরের চলনসই। আর ছেলেই বা তোমার কোন্ নবকার্ত্তিক।"

সহাস্যে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কত বয়স?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বছর এগারো হবে। তা মানানসই হ'তে পারবে। আঠার বছরের ছেলে, এগারো বছরের মেয়ে, মানাবে না? কি বল।"

রমা মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "তা মানাবে।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বংশ ভাল, বনেদি ঘরের মেয়ে। তবে কিছু দিতে থুতে পারবে না। চুলোয় যাক দেওয়া থোওয়া, মেয়েটী ভাল হ'লেই হলো। তোমার কি মত?"

রমা বলিল, "তা বৈকি বাবা।"

ঘোষাল মহাশয় স্বরটাকে অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া বলিলেন, "কি জান বৌমা, অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। আজকালকার মেয়েরা নিজের শ্বাশুড়ীর পাতেই ভাত দিতে চায় না, এতো তুমি পিস্ শাশুড়ী। কাজেই বংশটা ভাল হওয়া দরকার। আমি এক রকম সব স্থির ক'রেই ফেলেছি, কাল তারা এসে ছেলে দেখে একেবারে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে। এখন দেখ, তোমাদের কি মত।"

রমা বলিল, "আমার আবার মত কি বাবা? আমার মত—যদি তোমার পছন্দ হ'য়ে থাকে, তবে যত শীগ্‌গীর হয় কাজটা সেরে দাও।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আশায় নৈরাশ্য—গৃহত্যাগ

আহারান্তে ক্ষেত্রনাথ যখন বহির্গমনের উপক্রম করিতেছিল, তখন রমা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আজ বিকেলে কোথাও যাস্‌নি যেন।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

রমা বলিল, "কেন কি, দরকার আছে।"

ক্ষেত্রনাথ আড়ার উপর হইতে ছিপগাছটা পাড়িতে পাড়িতে বলিল, "দরকারটা কি শুনি।"

রমা। আজ তোকে দেখতে আসবে।

ক্ষেত্র। দেখতে? কেন, আমি ঠাকুর না দেবতা?

রমা ঈষৎ হাসিল; বলিল, "হাঁ, ঠাকুর দেবতা। এখন যা বলছি তাই শোন্‌।"

ক্ষেত্রনাথ বঁড়শীর তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি পিসীমা?"

রমা বলিল, "ব্যাপার আবার কি। তোকে বর দেখতে আসবে।"

ক্ষেত্র। কে?

রমা। গাংপুর থেকে।

ক্ষেত্র। কারণ?

রমা। কারণ, তোর বিয়ে।

ক্ষেত্র। কে বললে?

রমা। বলবে আবার কে? বাবা সব ঠিক ক'রে এসেছেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তোমার বাবা ঠিক ক'রে এসে থাকেন, তাঁকেই বিয়ে করতে ব'লো।"

রমার মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। ক্ষেত্রনাথ সহাস্যে বলিল, "বুড়োর পাকা মাথায় টোপর—বেশ মানাবে। আমি দু'টো ঢাকের বায়না দিয়ে আসছি।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে রমা বলিল, "মুখ সামলে কথা কইবি খেতা।"

পিসীমার রাগে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "সেটা না শিখলে হবে না পিসীমা, এখন বুড়োর বিয়েটা তো দেখা যাক্ আগে।"

ছিপ হাতে ক্ষেত্রনাথ উঠানে নামিল। রমা বলিল, "তামাসা নয় খেতা, সকাল সকাল বাড়ী ফিরবি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আজ আমার ফিরতে রাত হবে।"

রমা রাগিয়া বলিল, "কেন, কোন্ চুলোয় যাবে ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "যে চুলোতেই যাই, রাত দশটার এদিকে ফিরতে পারবো না।"

"তা হ'লে ক্ষেত্রনাথ"—ক্ষেত্রনাথ চলিয়া যাইতেছিল, দাদামশায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ঘোষাল মহাশয় ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তা হ'লে ক্ষেত্রনাথ, আর নাই বা বাড়ী ফিরলে ?"

অবজ্ঞার স্বরে ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "সে এক রকম মন্দ যুক্তি নয়।"

কঠোর স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মন্দ যখন নয়, তখন তাই করলেই ভাল হয় না ?"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "দেখা যাক্।"

ক্ষেত্রনাথ প্রস্থানোদ্যত হইল। ঘোষাল মহাশয় ডাকিয়া বলিলেন, "শোন।"

ক্ষেত্রনাথ দাঁড়াইল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির ক'রে এসেছি। আজ তারা দেখতে আসবে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তাদের বারণ ক'রে লোক পাঠান। বলেন তো আমিই গিয়ে ব'লে আসি।"

মুখভঙ্গী করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এতটা কষ্ট করতে পারবে?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আপনার জন্য না হয় করলাম।"

জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি।"

ক্ষেত্র। মানুষ কি সব কথাই রাখতে পারে?

ঘোষা। এ পর্য্যন্ত রামতারণ ঘোষালের কথার নড় চড় হয় নি।

ক্ষেত্র। না হয় একটা হ'লো।

ক্রোধে ক্ষোভে ঘোষাল মহাশয়ের বাক্‌শক্তি যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোন কথা আছে?"

ঘোষা। আছে।

ক্ষেত্র। ব'লে ফেলুন, আমার বেলা যায়।

ঘোষা। তুমি কি বিয়ে করবে না?

ক্ষেত্র। নিশ্চয় করবো। তবে ওখানে নয়।

ঘোষা। কোন্ খানে?

ক্ষেত্র। সে পরে বলবো।

ঘোষা। পরে নয়, এখনি বলতে হবে।

ক্ষেত্র। আমার তো আপনার মত ভীমরথী হয় নি।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "খবরদার খেতা তোকে বিয়ে করতেই হবে।"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কারণ?"

ঘোষা। কারণ আমার হুকুম।

ক্ষেত্র। কেন, আপনার ভাত খাই ব'লে?

চীৎকার করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, ভাত খাও ব'লে।"

ক্ষেত্রনাথ ছিপগাছা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "যদি না খাই?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "না খাও, দূর হ'য়ে যাও।"

ক্ষেত্রনাথ ছিপগাছা মাটীতে ফেলিয়া মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "বেশ, তাই না হয় যাব।"

"যাব নয়, যাও।"

"এখনি?"

"এই মুহূর্ত্তে।"

ক্ষেত্রনাথ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিল। ঘরে ঢুকিয়া ত্রস্তহস্তে জামা গায়ে দিল, ছাতাটা লইল, চটী জুতা পায়ে দিল। ঘোষাল মহাশয় তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "জামা কাপড়গুলা তোমার বাবার রোজগার করা নয় গো, নবাব পুত্তুর।"

ভ্রূকুটী করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "ভয় নাই, এগুলো ফেরৎ পাবেন।"

ক্ষেত্রনাথ দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় দাঁড়াইয়া অজগরশ্বাসবৎ ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

রমা এতক্ষণ যেন কাঠ হইয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে শ্বশুরের কাছে আসিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "চুলোয় যাক্ বাবা, ওর জন্য তুমি দুখ্যু ক'রো না।"

ঘোষাল মহাশয় অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দুখ্যু? তুমি ক্ষেপেছ বৌমা, ঐ হতভাগা নেমকহারামের জন্যে আমি দুখ্যু করবো? এ আর কেউ নয় বৌমা, রামতারণ ঘোষাল; ভবা ছোঁড়াকে নিজের হাতে পুড়িয়ে এসেছি। আর ঐ পরের ছেলে, চেংড়া ছোঁড়ার জন্যে দুখ্যু করবো? ভাত বাড় বৌমা, অনেক বেলা হয়েছে।"

রমা তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিল। ঘোষাল মহাশয় গিয়া আহারে বসিলেন, এবং সেদিন তিনি এত ক্ষিপ্রহস্তে আহার শেষ করিলেন যে, রমা তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

আহারান্তে ঘোষাল মহাশয় ছাতা চাদর লইয়া বাহির হইলেন। রমা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "পাপের প্রায়শ্চিত্তটা ক'রে আসি। ভদ্রলোক এসে ফিরে যাবে? তখনই বলেছিলাম বৌমা, পরের ছেলে। কর্ম্মভোগ, কর্ম্মভোগ। এ ভোগের শেষ কবে হবে দামোদর!"

সন্ধ্যার সময় ঘোষাল মহাশয় যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া রমা ভীত না হইয়া থাকিতে পারিল না। ঘোষাল মহাশয় আসিয়া অবসন্নভাবে দাবার উপর বসিয়া পড়িলেন; গভীর বেদনা-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "সে চ'লে গেছে বৌমা, সত্যি চ'লে গেছে।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কলকাতায়।"

রমা বলিল, "কলকাতায়? কলকাতায় কে আছে?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তা

জানি না, তবে সে চলে গেছে। দীনু নন্দী ইষ্টিশানে তাকে কলকাতার টিকিট কিনতে দেখে এসেছে।"

রমা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। দিনের শেষ আলোটুকু নিবিয়া গেল; স্তূপে স্তূপে অন্ধকার আসিয়া গৃহ, প্রাঙ্গন ঢাকিয়া ফেলিল। রমা ডাকিল, "আহ্নিকের সময় হ'য়েছে বাবা!"

স্তব্ধ অন্ধকার রাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘোষাল মহাশয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "দামোদর, আমার সন্ধ্যা কি এখনো হয় নি ঠাকুর?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জেঠাই মা

কলিকাতায় ক্ষেত্রনাথের তেমন নিকট আত্মীয় কেহ ছিল না, এক দূর সম্পর্কের মাসী ছিল, মায়ের মামাতো ভগ্নী। ক্ষেত্রনাথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মাসীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

মেসো যতীন বাবু মোটা মাহিনার চাকরী করিলেও একটু কৃপণ-প্রকৃতির লোক ছিলেন। কৃপণ বলিয়া কঞ্জুষ ছিলেন না, বাজে খরচের বিরোধী ছিলেন। স্ত্রী ব্রজসুন্দরী সংসারের দিকে লক্ষ্য করিবার বড় অবকাশ পাইতেন না; তিনি আপনার ক্ষুন্ন স্বাস্থ্য এবং তিন চারিটি ছেলে মেয়ে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। বিধবা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ দুর্গা দেবীই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। কেবল কর্ত্রী নহে, তিনি যতীন বাবুর জননীস্থানীয়াও ছিলেন। চারি বৎসর বয়সে মাতৃক্রোড়চ্যুত হইয়া যতীন বাবু জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অসীম স্নেহযত্নে লালিত হইয়া মাতার অভাব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সংসারে মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াও যতীন বাবু সে কথাটা ভুলেন নাই, তিনি ভ্রাতৃজায়াকে এ পর্য্যন্ত ঠিক মাতার সম্মান প্রদান করিয়াই আসিতেছিলেন; কেবল সম্মান নহে, তাঁহাকে একটু ভয় করিয়াও চলিতেন।

যতীন বাবু চাকরী করিয়া আগে মাহিনার টাকা সমস্তই দুর্গা দেবীর হাতে দিতেন। দুর্গা দেবী বুঝিয়া খরচ করিতেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরী ঘরে আসিবার কিছুদিন পরে একদিন যতীন বাবু তাঁহাকে বলিলেন,

"তাই তো বৌদিদি, মাইনের টাকাগুলো যদি সব খরচ হ'য়ে যায়, তবে এর পর কি হবে? যদি দু'একটা মেয়ে জন্মায়?"

চতুরা দুর্গা দেবী বলিলেন, "ঠিক কথা ঠাকুরপো, আমিও মাঝে মাঝে ঐ কথাটা ভাবি। তা আমি মেয়ে মানুষ, ঠিক বুঝে খরচ পাতি করতে পারি না। এখন হ'তে এক কাজ কর, মাইনের টাকা নিজের হাতে রাখ। আমাকে নিত্যিকার খরচ হিসেব ক'রে দেবে, তাইতেই আমি চালিয়ে দেব।"

তদবধি যতীন বাবুর নিজের স্বতন্ত্র তহবিল হইল। বছর কয়েক পরে দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন যে, ব্যাঙ্কে যতীনের পাঁচ হাজার টাকা জমিয়াছে, তখন তিনি সাহ্লাদে দেবরকে বলিলেন, "দেখ দেখি ঠাকুরপো, ভাগ্যে তোমার হাতে সব ছেড়ে ছিলাম। আমার হাতে থাকলে কি এক পয়সাও জমতো? মেয়ে মানুষে কি এত বুঝে চলতে পারে? মুখে আগুন মেয়ে মানুষের!"

মৃদু হাসিয়া যতীন বাবু বলিলেন, "মেয়ে মানুষের মুখে আগুন লাগলে যতীন শর্ম্মাকে টাকা রোজগার করতে হ'তো না বৌদি, এতদিন তার হাড় ক'খানাও খুঁজে পাওয়া যেত না। তবে বৌদি, যা জমেছে, এ তো একটা মেয়ের বিয়ে দিতেই সাবাড় হ'য়ে যাবে।"

দুর্গাদেবী সোৎসাহে বলিলেন, "ততদিন কোন্ না আর এতগুলা জমবে।"

কিন্তু তখন আর এত সহজে জমিবার সম্ভাবনা ছিল না। কেন না, ব্রজসুন্দরী তখন দুইটী পুত্র দুইটী কন্যা প্রসব করিয়া খরচের দিকটাকে বেশ ভারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। যদিও তখনও জমার দিকের পাল্লাটা খরচের পাল্লার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই চলিতেছিল, বরং সেদিকটা

একটু বেশী ভারী ছিল, তথাপি যতীন বাবু বুঝিয়াছিলেন, এ গুরুত্বটুকু অধিকদিন বজায় থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি এই সময়ে যতটা পারিতেছিলেন, হাত টানিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার ফলে দুর্গা দেবীর সহিত মধ্যে মধ্যে তাঁহার যে একটু বাক্‌বিতণ্ডা না হইত এমন নহে, তবে দুর্গা দেবী দেবরের সাধু উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে বচসাকে কখনও কলহে পরিণত হইতে দেন নাই।

এমনই সময়ে ক্ষেত্রনাথ যখন অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া তথায় স্থায়ী আশ্রয় গ্রহণের সম্ভাবনা প্রকাশ করিল, তখন যতীন বাবু একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বোনপোর মতলব খানা কি?"

ব্রজসুন্দরী উত্তর দিলেন, "বোনপোর মতলব বোনপোই জানে, আমি তার কি জানবো?"

যতী। তুমি মাসী, আপনার লোক, জানবার চেষ্টা করাও তো উচিত।

ব্রজ। আমার এখনো এত মাথাব্যথা হয় নি।

যতী। তোমার না হয়, আমার যে ভয়ানক মাথাব্যথা উপস্থিত হ'য়েছে। একটা লোকের পিছনে মাসে কত পড়ে তা জান?

ব্রজ। আমার অত জানাজানির দরকার নাই। আমি কি তাকে ডেকে আনতে গিয়েছি?

যতী। না ডাকলেও সে যখন এসেছে, আর এই এক মাসেও যাবার কথাটা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছে, তখন সেটা তার মনে করিয়ে দেওয়াও তো দরকার।

ব্রজ। দরকার হয়, তুমিও তো মনে করিয়ে দিতে পার?

যতী। তা পারি, তবে সেটা কিছু বেশী রূঢ় হ'য়ে পড়বে, তাই বলছি।

ব্রজসুন্দরী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "রূঢ় হোক, আর যাই হোক, আমি কিছু বলতে পারব না। আমি তোমাদের সংসারের কোন্ কথায় আছি?"

অগত্যা যতীন বাবু নিরস্ত হইলেন।

পরদিন যতীন বাবু আফিসে যাইবার সময় সকলের জলখাবার পয়সা দিতে গিয়া চারিটা পয়সা কম দিলেন। দুর্গাদেবী পয়সাগুলাকে দুই তিনবার গণিয়া বলিলেন, "চারটে পয়সা কম হ'লো না ঠাকুরপো?"

যতীন বাবু মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কম হবে কেন? যা বরাবর দিয়ে আসছি তাই দিয়েছি।"

দুর্গাদেবী তখন প্রত্যেকের নাম ধরিয়া হিসাব করিতে করিতে বলিলেন, "এই তো অমির চার পয়সা, এই ধীরের চার পয়সা, এই পুঁটীর চার পয়সা, এই বোয়ের চার পয়সা, আর খেতুর—"

দুর্গাদেবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেবরের মুখের দিকে চাহিলেন। যতীন বাবু মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অত খেতু মাতু রাধু আমি জানি না, আর আমার পয়সা নাই।"

দুর্গাদেবী ঘাড় হেঁট করিয়া পয়সাগুলাকে একবার ডান হাতে একবার বাঁ হাতে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "সেটা কি ভাল হয় ঠাকুরপো! কুটুমের ছেলে, কি মনে করবে।"

রাগত ভাবে যতীন বাবু বলিলেন, "মনে করবে, কুটুমের ছেলের কুটুম বাড়ীতে এসে দু'চার মাস কুটুম্বিতা করা উচিত হয় না।"

যতীন বাবু বাহির হইয়া গেলেন। দুর্গাদেবী দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে পয়সাগুলা নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন।

তারপর ছেলেদের জলখাবার পয়সা দিবার সময় দুর্গাদেবী নিজের বাক্স হইতে পয়সা লইয়া খেতুকে দিলেন। খেতুর পয়সা লইয়া জেঠাই-মার সহিত পিতার বচসা অমি সব শুনিয়াছিল, সুতরাং খেতুকে পয়সা দিতে দেখিয়া সে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "খেতু দাদাকে যে পয়সা দিলে জেঠাই মা?"

দুর্গাদেবী তাহার দিকে চাহিয়া চোক টিপিতে টিপিতে বলিলেন, "কেন দেব না লা?"

অমি কিন্তু জেঠাই মার ইঙ্গিত না বুঝিয়া বলিল "হাঁ, দেবে বৈকি, বাবা ব'লেছে, খেতু দাদাকে জলখাবারের পয়সা দেবে না।"

দুর্গাদেবী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোর মাথা! হতভাগা মেয়ে!"

অমি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। খেতু পয়সা চারিটা লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

পরদিন খেতু জলখাবারের পয়সা লইতে আসিল না। সন্ধ্যার সময় দুর্গাদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে পয়সা নিতে এলি না খেতু?"

খেতু সহাস্যে উত্তর করিল, "বড় অম্বল হ'য়েছে জেঠাই মা, বিকেলে আর জল খাব না। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, এসব কচুরী গজা কি আমাদের সহ্য হয়?"

জেঠাইমা চুপ করিয়া রহিলেন। খেতু বলিল, "ওবেলাকার ভাত আছে জেঠাইমা? থাকেতো দাও।"

জেঠাইমা বলিলেন, "এই তোর অম্বল হ'য়েছে, আর ওবেলার ভাত খাবি?"

খেতু বলিল, "তা খেলেই বা, তাতে আমাদের কোন অসুখ হয় না। আমরা পাড়াগেঁয়ে কি না।"

খেতু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; সে হাসিতে জেঠাই মার কিন্তু চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল।

খেতুকে ভাত দিয়া দুর্গাদেবী পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারে খেতু, তুই রাগ ক'রেছিস ?"

খেতু হো হো শব্দে এমন হাসিয়া উঠিল যে, তাহার হাসি দেখিয়া দুর্গাদেবী সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। খেতু খুব খানিকটা হাসিয়া খানিকটা কাশিয়া একটু নিরস্ত হইলে দুর্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসলি যে ?"

খেতু বলিল, "তোমার কথা শুনে। ব'লে তুই রাগ করেছিস্ !"

খেতু পুনরায় হাসিয়া উঠিল। দুর্গাদেবী বলিলেন, "তা আমি এমন কি মন্দ কথা বলেছি। রাগ তাপ তো সকলেরি আছে ?"

খেতু ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, "যার আছে তার আছে। তাই ব'লে কি আমারও থাকবে ?"

দু। কেন, তুই কি ?

খে। আমি কি ? আমার মা বাপ ভাই বন্ধু, তিন কুলে কেউ নাই, মাথা রেখে দাঁড়াবার জায়গাটী পর্য্যন্ত নাই। আমার মত লোকে রাগ করতে পারে জেঠাই মা ? তুমি দেখছি নেহাৎ পাগল।"

খেতু একগ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া জেঠাইমার মুখের দিকে চাহিল। দুর্গাদেবী একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোর রাগই যদি নাই, তবে পিসীর বাড়ী ছেড়ে চলে এলি কেন ?"

খেতু মুখের ভাত গুলা গলাধঃ করিয়া বলিল, "চলে আসব না ?

চিরকালটাই কি পরের ভাতে থাকবো ? বেটা ছেলে, হাত পা আছে, দু'দিন পরে বিয়ে থা করতে হবে, নিজের একটা সংস্থান চাই না ?"

দু। চাকরী করবি ?

খে। তা নয় তো কি তোমাদের বাড়ীতে শুধু শুধু অন্নধ্বংস করতে এসেছি নাকি ? দাদামশায়ের ঘরে কি ভাতের অভাব ছিল ?

দুর্গাদেবী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যতীনকে বলবো তোর একটা চাকরীর চেষ্টা দেখতে।"

খেতু মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "দেখাদেখি কি, ক'রে দিতেই হবে। যা হয়, দু'টাকা দু'টাকাই সই। মোদ্দা চাকরী একটা চাই।"

দুর্গাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে এখন খেয়ে নে, সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে।"

দুর্গাদেবী যতীনবাবুকে খেতুর চাকরীর জন্য ধরিলেন। যতীন বাবু তাহার বিদ্যার পরীক্ষা লইয়া বুঝিলেন, আফিসের চাকরী তাহার দ্বারা সম্ভব নয়। ইহা শুনিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "তা আপিসের না হয়, আর কোথাও দু' পাঁচ টাকা মাইনের একটা চাকরী যোগাড় ক'রে দিতেই হবে।"

যতীন বাবু অনেক চেষ্টার পর একটী প্রাইভেট মাষ্টারী যোগাড় করিয়া দিলেন। তাঁহার অন্যতম বন্ধু দেবেন্দ্র বাবুর দুইটী ছেলে মেয়েকে বাঙ্গালা বর্ণ পরিচয় ও ইংরাজী ফাষ্ট বুক পড়াইতে হইবে ; বেতন আপাতত পাঁচ টাকা।

খেতু সানন্দে চাকরীতে নিযুক্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খেতুর চিঠি

ঘোষাল মহাশয় বাড়ী ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "বৌমা, তোমার ক্ষেত্রনাথ বাবু চিঠি দিয়েছেন গো।"

রমা অতিমাত্র আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "চিঠি দিয়েছে ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, এতদিন পরে দয়া ক'রে চিঠি লিখেছেন।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছে বাবা ?"

মুখ ভঙ্গী করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "লিখেছে—কত কি লিখেছে। আমি হেন, আমি তেন, এই রকম কত কথা।"

রমা সাগ্রহে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় খামের ভিতর হইতে চিঠি খানা বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "শোন, তোমার আক্ষেপটা থাকে কেন।"

ঘোষাল মহাশয় পত্র পড়িতে লাগিলেন ;—

"শ্রীচরণকমলেষু,

শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন—"

ওঃ ভক্তির বহরটা একবার দেখ। আমার হ'লো শ্রীচরণ, তাতে খেতার অসংখ্য প্রণাম। বাহবা ক্ষেত্রনাথ বাবু !

"আমি কলকেতায় এসেছি। এখানে মাসীর বাড়ীতে আছি।"

রমার মুখের দিকে চাহিয়া ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসী —ওর আবার মাসী কোথা হ'তে এল গা বৌমা ?"

রমা একটু ভাবিয়া বলিল, "মাসী! ওর মায়ের এক মামাতো বোন আছে। তারা কলকাতায় থাকে। মেসো নাকি অনেক টাকা রোজগার করে।"

বিকৃত মুখে "বটে" বলিয়া ঘোষাল মহাশয় পুনরায় পড়িতে লাগিলেন,—

"এখানে আমি এক রকম সুখেই আছি, বিশেষ কোন কষ্ট নাই। জেঠাই মা আমাকে যেন মায়ের মত যত্ন আত্তি করেন।"

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ইনি আবার কে?"

রমা নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "কি জানি।"

"চুলোয় যাক্" বলিয়া ঘোষাল মহাশয় পড়িলেন,—

"পাছে আমার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়, পাছে আমি মনে কিছু করি, এই তাঁর নিয়ত ভাবনা। আমি যেন তাঁর পেটের ছেলে। (হুঁঃ) আমার জন্য আপনারা কিছু ভাবনা চিন্তা করবেন না।"

"হুঃ, বাবুর জন্য ভেবে ভেবে তো আমার পেটের ভাত হজম হয় না।"

পত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ টীকা টীপ্পনী কাটিতে কাটিতে ঘোষাল মহাশয় পত্রপাঠ শেষ করিলেন। আমরা তাঁহার টীকা টীপ্পনী বাদ দিয়া অতঃপর পত্রখানার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। ইহার পর ক্ষেত্রনাথ লিখিয়াছে যে, তাহার চাকরী হইয়াছে। ছেলে পড়ান চাকরী, মাহিনা পাঁচ টাকা। দুই চারি মাস পরে মাহিনা বাড়িতে পারে। আর এই অবসরে সে অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা করিয়াও লইতে পারে। পরে যাহা হয় লিখিবে, আপাতত সে ভালই আছে। পিসীমা বা দাদামহাশয় তাহার জন্য যেন কিছুমাত্র চিন্তিত না হন।

পত্রখানা পুনরায় মুড়িয়া খামের ভিতর রাখিতে রাখিতে ঘোষাল মহাশয় রুক্ষকণ্ঠে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "ওঃ, ভারী আমার

আপনার লোক, মাসীর মায়ের বোনপোবোয়ের নাতজামাই, তাঁর তরে আমি ভাবতে যাব। আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই। বোয়ে গেছে আমার ভাবতে। তার চেয়ে আমার এখন পরকালের ভাবনা ভাবলে কাজ হবে।"

ঘোষাল মহাশয় মুখে এই গভীর ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেও মনে মনে যে তিনি ক্ষেত্রনাথের ভাবনা নিয়ত ভাবিয়া থাকেন ইহা রমা বেশ জানিত। এমন কি, খেতুর ভাবনায় তাঁহার পরকালের চিন্তাতেও যে অনেকটা ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাও তাহার অগোচর ছিল না। পরকালের সম্বলের জন্য ব্যস্ততা থাকিলেও এখন আর পূজায় তাঁহার পূর্ব্ববৎ গভীর মনোযোগ দেখা যাইত না, তাঁহার ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর স্তোত্রধ্বনি রমা আর শুনিতে পাইত না। আগে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার কমে তিনি বাহির হইতেন না, এখন কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই পূজা শেষ হইয়া যায়। আগেকার মত পূজায় আর একাগ্রতা ছিল না। পূজা করিতে করিতে এক একবার যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন, উৎকর্ণ হইয়া যেন কাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার আশায় দ্বারের দিকে ফিরিয়া চাহেন। পরক্ষণেই গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় আচমন করেন। আগে তিনি দামোদরকে যেরূপ পুষ্পচন্দনে ভূষিত করিয়া রাখিতেন, দেখিলেই মনে হইত, যেন ভক্তের ভক্তিবিহ্বল-হৃদয়নিঃসৃত অর্ঘরাজি আরাধ্য দেবতাকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এখন আর সে প্রাণের আবেগসম্ভূত পূজার অর্ঘ দেখা যাইত না। দেবতার গাত্রলগ্ন পুরাতন চন্দনচিহ্নও অনেকদিন পরিষ্কৃত হইত না; ফুলগুলা দেবতার চরণ পর্য্যন্ত পৌঁছিত না, কতক পুষ্পপাত্রেই পড়িয়া শুষ্ক হইতে থাকিত।

অথচ ঘোষাল মহাশয় প্রায়ই বলিতেন, "সব মায়ার বন্ধন, মায়ার বন্ধন; এ বাঁধন যত আল্‌গা হ'য়ে আসবে, ততই দামোদরকে আঁকড়ে ধরতে পারবো।" কিন্তু মায়ার বন্ধনের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল মহাশয়ের দামোদরকে আঁকড়াইয়া ধরিবার শক্তিও যে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না।

ঘোষাল মহাশয়ের আহারেও রুচি ছিল না। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নিরামিষাশী হইয়াছিলেন। তারপর ক্ষেত্রনাথের জন্য যখন মাছ আসিতে লাগিল, তখন বধূর আগ্রহে তিনি আবার মাছ খাইতে আরম্ভ করিলেন. কিন্তু ক্ষেত্রনাথ চলিয়া গেলে, তিনি মাছ আনা ছাড়িয়া দিলেন। রমা একদিন তাঁহাকে মাছ আনিতে বলিলে তিনি বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর মাছ কেন বৌমা, এখনো কি আমার মাছ খাবার সময় আছে? মাছের হাঁড়ি শিকেয় তুলে রাখ। খেতা যদি কখনো আসে, তখন আবার পাড়বে।"

কথাটা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নপল্লব আর্দ্র, স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

ঘোষাল মহাশয় মাঝে মাঝে বলিতেন বটে, "আঃ, ছোঁড়াটা গিয়েছে না বাঁচা গেছে। হতভাগা আমাকে এমনি ব্যতিব্যস্ত ক'রে রেখেছিল যে,—বুড়ো বয়সে কি এ সব জ্বালা যন্ত্রণা আর সহ্য হয়? বেঁচেছি, হাড়ে বাতাস লেগেছে।"

কিন্তু কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের বক্ষঃপঞ্জরগুলা আলোড়িত করিয়া এমনই একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইত যে, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইত, ক্ষেত্রনাথ চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার শোকদগ্ধ অস্থিগুলা একটুও স্নিগ্ধ হয় নাই, বরং শোকের আগুনে তাহা অহরহ আরও প্রজ্বলিত হইতেছে।

আবার এক এক সময়ে তিনি ক্ষেত্রনাথের গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ হইতেন। সকালে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিয়া ফুলগুলার দিকে উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে বলিতেন, "হা দেখ বৌমা, ছোঁড়া দোষে গুণে এক রকম মন্দ ছিল না। এই দেখ না, কেমন ফুলগাছ তৈরী ক'রে গেছে। এক একটা গোলাপ দেখেছ, যেন একটা স্থলপদ্ম। দু' তিনটে গাছ শুকিয়ে যাচ্চে। যাক্, আমি আবার এই বয়সে কলসী ঘাড়ে ক'রে জল ঢালতে যাব নাকি? ইস্, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই।"

রমার চোখ দুইটা ছল ছল করিয়া আসিত। ঘোষাল মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিয়া গাঢ় স্বরে বলিতেন, "কিন্তু হ'লে কি হবে বৌমা, পরের ছেলে। কথাতেই আছে—'পরের বিড়াল খায়, বন পানে চায়।' আমি বরাবরই জানতাম, হাত পা হ'লেই আপনার পথ দেখবে। যেতে দাও, ওসব নেমকহারামের জন্য আবার দুঃখ করে! তার চেয়ে দামোদরকে ডাক, ইহকাল পরকালের উপায় হবে। আমি তো ও নেমকহারামের কথা একবারও ভাবিনা বৌমা।"

তারপর যেদিন ক্ষেত্রনাথের পত্র আসিল, সেদিন ঘোষাল মহাশয় যেন অতিমাত্র অস্থির হইয়া উঠিলেন। সারাদিন খেতাকে গালাগালি দিলেন, তাহার অকৃতজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া নানাপ্রকার তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বৃদ্ধ বয়সে শেষ খেয়ায় পা দিবার সময় একটা নিঃসম্পর্কীয় বালকের উপর মমতা-পরবশ হওয়ায় আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অধীরতা দেখিয়া রমা বলিল, "হাঁ বাবা, তাকে আসতে লিখলে হয় না?"

ঘোষাল মহাশয়ের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল; তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি, আমি তাকে আসতে লিখবো? আমার গলায় কি

বড়ি জোটে না ? তুমি বল কি বৌমা, যে এই বয়সে আমাকে ফেলে স্বচ্ছন্দে চ'লে গেল, একবারও ফিরে চাইলে না, সেই নেমকহারামকে আমি আবার আদর ক'রে ডেকে আনবো ? কেন, তার তরে কি আমার ভাত হজম হয় না ? রাত্রে ঘুম হয় না ? আমি রামতারণ ঘোষাল বৌমা, আমি কারো তোয়াক্কা রাখি না।"

বৃদ্ধের কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুইটা জলে টল টল করিতে লাগিল।

হায় বৃদ্ধ ! পাথরের বাঁধ দিয়া নদীর বেগ রুদ্ধ করিতে পার, কিন্তু তাহার রুদ্ধ উচ্ছ্বসিত জলরাশি সেই সুদৃঢ় প্রস্তরবন্ধন অতিক্রম করিয়া যে প্রচণ্ড জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিতে পারে, সংসারে এত দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমার এ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই ?

পরদিন ঘোষাল মহাশয় একখানা পত্র লিখিয়া বধূকে শুনাইতে আসিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেমন চিঠী লিখেছি শুন বৌমা, তার মুখের মত জুতো হয়েছে কি না শোন।"

"পরমশুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ

তোমার পত্র পাইলাম, কিন্তু তাহাতে আনন্দ বা কষ্ট কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না। কারণ, তুমি যখন আমাদের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছ, তখন তুমি সুখেই থাক বা দুঃখেই থাক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি আছে বলিয়া মনে করি না। তোমার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি ? তুমি আমাদের ভাত খাইয়া মানুষ হইয়াছ এই মাত্র। এখন যদি তুমি নিজের পেটের ভাত নিজেই যোগাড় করিয়া লইতে পার, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই জানিবে। তোমার জন্য আমাদের একটুও চিন্তা নাই। ইতি"

"চিঠীখানা বড় কড়া হ'য়েছে, না বৌমা ?"

রমা নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "একটু হ'য়েছে।"

তীব্রস্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন,"একটু কেন, বেশ কড়া হ'য়েছে। তা হ'লেই বা কড়া? রাগ করে, বোয়েই গেল, সে তো আমার রোজ মাপে না যে তার রাগকে আমি ভয় করবো? তবে একটু মনঃকষ্ট হবে তার; তা কি করবো বল, আমার হাত দিয়ে অমন তেল-বুলান মোলায়েম কথা বের হয় না।"

রমা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় চিঠীখানাকে চোখের খুব কাছে আনিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিলেন।

চিঠীখানা দুই তিনবার পড়িয়া ঘোষাল মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি বৌমা, চিঠীখানা বড্ড কড়াই হয়েছে বটে। ছোঁড়া হয় তো প'ড়ে কেঁদেই ফেলবে। যতই পর হোক্ না গা, এতকালের একটা মায়া তো আছে। দূর হোক্, কাজ নাই এত কড়া চিঠী লিখে।"

ঘোষাল মহাশয় চিঠীখানাকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিলেন। তারপর হতাশস্বরে বলিলেন, "কিন্তু কি লিখি? নরম কথা যে আমার মোটেই আসে না। আঃ, কি ফ্যাসাদেই পড়েছি গা। দামোদর! আর কত কর্ম্মভোগ বাকী আছে দয়াময়!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে বৃদ্ধের বক্ষঃপঞ্জরগুলা কাঁপিয়া উঠিল। রমা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সরিয়া গেল।

সেই দিন ঘোষাল মহাশয় যখন নিমিদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বাজারে যাইতেছিলেন, তখন নিমি তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দাদামশাই, তোমাদের খেতুর চিঠীপত্তর এসেছে?"

ঘোষাল মহাশয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে?"

নিমি বলিল, "মা জিগ্যেস কল্লেন।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "চিঠী এসেছে; তোর মাকে বলিস্, সে চিঠী দিয়েছে, ভাল আছে। চাকরী কচ্চে, বুঝলি, বাবু চাকরী কচ্চে। পাঁচ টাকা মাইনের চাকরী। ঝাঁটা মার অমন চাকরীর মুখে।"

কথা শেষ করিয়াই ঘোষাল মহাশয় দ্রুতপদক্ষেপে বাজারের দিকে চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অরক্ষণীয়া

নিমি অরক্ষণীয়া হইয়া না পড়িলেও লোকে কিন্তু নিমির মাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এত বড় মেয়ে ঘরে রাখিয়া কিরূপে পেট ভাত দিতেছে, অনেকেই নিমির মাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিত। কেহ বা ভীতি প্রকাশ করিয়া বলিত, "ও নিমির মা, শেষে কি চোদ্দপুরুষকে নরকস্থ করবি?" নিমির মা এসকল কথার প্রায়ই উত্তর দিত না। ক্বচিৎ উত্তর দিলেও সবিনয়ে বলিত, "কি করবো মা, গরীব মানুষ।"

উপদেশদাত্রী বলিত, "হ'লেই বা গরীব গা. গরীবের মেয়ের কি বিয়ে হয় না? এই যে তোমারই দেওর বলরামঠাকুরের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। সেও তো আর বড়মানুষ নয়?"

অপরা উপদেশদাত্রী ঘোষগিন্নী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতেন, "ওমা, সে গরীব, গরীবের ঘর দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিমির মা তো তা পারে না। ওর মেয়েকে নিতে শ্বেত হস্তীতে চ'ড়ে রাজপুত্তুর আসবে।"

এই তীব্র শ্লেষ বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া নিমির মা শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত।

নিমির মা নিশ্চিন্ত থাকিলেও বলরাম কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি প্রায়ই এক একটা সম্বন্ধ আনিয়া উপস্থিত করিতেন, এবং প্রত্যেক পাত্রকেই রাজপুত্র অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু গ্রামে বলরামেরও দুই এক জন শত্রু ছিল।

তাহারা যখন নিমির মার কাছে পাত্রের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে শোচনীয় সংবাদ প্রদান করিত, তখন নিমির মা দেবরের আনীত সম্বন্ধে অস্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বলরাম বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "তুমি বুঝছ না বড় বৌ, এসব শত্রুপক্ষের কাণভাঙ্গানী কথা।" কিন্তু শত্রুপক্ষেরা নিমির মাকে বুঝাইয়া দিত যে, বলরাম ঠাকুর বরপক্ষের নিকট হইতে নগদ দুইশত টাকা চুক্তি করিয়া লইয়াছে।

দুই পক্ষের দুই রকম কথায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া শেষে নিমির মা আর কোন পক্ষের কথাতেই কাণ দিলেন না। লোকে তাঁহার অদ্ভুত নিশ্চিন্তা দেখিয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিল, নিমির মা কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

নিমির মার এই নিশ্চিন্ততার একটু কারণও যে ছিল না এমন নয়। খেতু যেদিন রাগ করিয়া দাদামহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করে, সেদিন সে কলিকাতা যাইবার গাড়ীভাড়া আটগণ্ডা পয়সার জন্য মাসীমাকে আসিয়া ধরিল। মাসীমার হাতে পয়সা না থাকিলেও তিনি খেতুকে নিরাশ করিতে পারিলেন না। ঘটীটা বাঁধা দিয়া আটগণ্ডা পয়সা আনিয়া খেতুকে দিলেন। পয়সা পাইয়া খেতু উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, "আমি এখন চললাম মাসীমা, তুমি কিন্তু নিমির বিয়ের তরে একটুও ভেব না, ওর বিয়ের ভার আমার। আগে একটা চাকরীর যোগাড় ক'রে খাবার সংস্থান করি, তারপর এসে সব কথা কইবো।"

ঘটী বাঁধা দিয়া খেতুকে পয়সা দেওয়ায় নিমি গর্জ্জন করিতে লাগিল। খেতু তাহার মুখের উপর গর্ব্বপ্রফুল্ল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, মাসীমার পায়ের ধূলা লইয়া চলিয়া গেল। মাসীমা খেতুর আশ্বাসবাণীটুকু অন্তরে গাঁথিয়া রাখিলেন।

খেতু চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরেই বলরাম ইছাপুর হইতে একটা সম্বন্ধ আনিলেন। পাত্র নিরক্ষর বা চরিত্রহীন নহে, অবস্থাও মন্দ নয়, দোষের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও পাত্রের বয়স খুব বেশী নয়, ত্রিশ বত্রিশ মাত্র। ইছাপুর সে গ্রামের খুব কাছাকাছি, সুতরাং প্রতিবেশীদের মধ্যেও অনেকেই পাত্রের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, এবং ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাত্রে নিমিকে সম্প্রদান করিবার কল্পনা যে বাতুলতা মাত্র এরূপ মতও প্রকাশ করিল। নিমির মা কিন্তু এরূপ প্রার্থনীয় সম্বন্ধও পরিত্যাগ করিল। লোকে বলিল, নিমির নিতান্ত দুরদৃষ্ট। বলরাম প্রতিজ্ঞা করিলেন, অতঃপর তিনি যদি আর নিমির বিবাহের চেষ্টা করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ হইতে খারিজ। এ সকল কথা শুনিয়াও নিমির মা বিচলিত হইলেন না।

সম্বন্ধটা যখন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল, এবং পাড়ার পাঁচজনে নিমির মার বিবেচনার উপর দোষারোপ করিতে লাগিল, তখন নিমির মার যেন একটু ভয় হইল। শুধু খেতুর কথায় নির্ভর করিয়া তিনি এমন সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক কি তাহার উপর এতখানি নির্ভর করা যায়? সে খেয়ালের বশে একটা কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, কে জানে, দুইদিন পরে কথাটা তাহার মনে থাকিবে কি না। কে জানে, সে এই গ্রামে আর ফিরিয়াই আসিবে কি না। এ স্থান তাহার জন্মভূমি নহে, এখানে তাহার ঘরবাড়ী কিছুই নাই, তেমন নিকট আত্মীয়ও নাই বলিলেও চলে। এমন আকর্ষণ কিছুই নাই যাহাতে তাহাকে এ গ্রামে আসিতেই হইবে। যদি সে না আসে, যদি সে খেয়ালের কথা ভুলিয়া যায়? কিন্তু এতটা হইবে কি?

মা মেয়েকে বলিলেন, "নিমি, খেতুদের বাড়ী একবার যা তো।"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

মা বলিলেন, "জেনে আয়, খেতুর কোন চিঠিপত্তর এসেছে কি না।"

মুখ ভার করিয়া নিমি বলিল, "আমি পারব না।"

মা রাগিয়া বলিলেন, "খেতে পারবি ?"

মেয়েও রাগিয়া জোর গলায় উত্তর দিল, "হাঁ, পারবো।"

মা। খাওয়া আসবে কোথা হ'তে ? আমি যোগাতে পারব না।

নিমি। তা পারবে কেন, ঘটী বাটী বেচে খেতুকে পয়সা দিতে পারবে।

মা হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "হতভাগা মেয়ে, তার উপর তোর এত রিষ কেন লা ? সে তোর কি ভাগ কেড়ে নিয়েছে ?"

গর্জ্জন করিয়া নিমি বলিল, "না, নেয়নি ? কেন তুমি তাকে এত ভালবাসবে বল তো ?"

মেয়ের ক্রোধের কারণ বুঝিয়া মায়ের চোখ দুইটা স্নেহে আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার সিঁথির চুলগুলাকে এপাশে ওপাশে সরাইতে সরাইতে বলিলেন, "পাগলী মেয়ে ! তাকে ভালবাসলেই বা, তাই ব'লে তোকে কি ভালবাসি না ? তুই আগে সে পিছে। আহা, সে যে মা-হারা নিমি, তাকে ভালবাসতে আর কে আছে ?"

নিমি মুখ নীচু করিয়া গুম হইয়া রহিল। মা স্নেহ-কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, একবার গিয়ে খবরটা জেনে আয়। আহা, ছেলেটা ক'দিন গেছে, একটা খবর পাওয়া গেল না।"

নিমি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সহসা দ্রুত-পদে খেতুদের বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিমি ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, খেতুর কোন চিঠিপত্র আসে নাই। নিমির মার মুখখানা বড়ই ম্লান হইয়া আসিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া নিমি মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, খেতু চলে গেল কেন?"

মা বলিলেন, "রাগ ক'রে গিয়েছে।"

নিমি। এমন কি রাগ যে, দেশ ছেড়ে চলে গেল?

মা। তার দাদামশায় তাকে বিয়ে করতে বলেছিল, তাই নিয়ে দাদামশায়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিমি বলিল, "তা বিয়ে করতে ব'লেছিল, বিয়ে করলেই তো পারতো?"

ঈষৎ হাসিয়া মা বলিলেন, "তা তো পারতো, কিন্তু সেখানে বিয়ে করতে তার যে ইচ্ছা ছিল না।"

নিমি। তবে কোথায় বিয়ে করতে ইচ্ছা ছিল?

মা। কোথায় ইচ্ছা তা সে-ই জানে। তবে সে নিজের খাবার পরবার সংস্থান না ক'রে বিয়ে করবে না।

নিমি। কেন, তার দাদামশায়ের ঘরে কি খাবার পরবার অভাব?

মা। অভাব নাই, কিন্তু পরের ঘর, পরের ভাত।

একটু নীরব থাকিয়া নিমি ডাকিল, "আচ্ছা মা।"

মা। কি?

নিমি। আগে তো রাগ করলে আমাদের বাড়ীতে খেত।

মা। চিরকাল কি আর খাবে? বেটা ছেলে, নিজের অন্নসংস্থান করবে না?

একটু তাচ্ছীল্যের স্বরে নিমি বলিল, "ইঃ, ভারী তো বেটা ছেলে!"

মা কোন উত্তর করিলেন না। নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, সে কি আর আসবে না ?"

মা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "বালাই, আসবে না কেন ? আসবে বৈ কি।"

নিমি বলিল, "কবে আসবে ? এই তো প্রায় একমাস হ'লো গেছে।"

মা একটু হাসিলেন ; কিন্তু অন্ধকারে নিমি তাহা দেখিতে পাইল না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ নিমি, খেতু চ'লে যাওয়ায় তোর একটু কষ্ট হয়েছে, না ?"

নিমি অন্ধকারে ঘাড় নাড়িয়া জোর গলায় উত্তর দিল, "উঁ-হুঁ।"

মা মনে মনে হাসিলেন। খানিকপরে নিমিকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। বুঝিলেন, নিমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে দাদামশায়ের নিকট খেতুর সংবাদ পাইয়া নিমি ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিল, এবং ব্যগ্রস্বরে বলিল, "খেতুর চিঠি এসেছে মা।"

মা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "চিঠী এসেছে ?"

ঘাড় দোলাইয়া হাত নাড়িয়া নিমি একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "হাঁগো হাঁ, এসেছে। চাকরী হয়েছে, পাঁচ টাকা মাইনের চাকরী, বুঝলে ?"

দশম পরিচ্ছেদ

পিতা পুত্রী

দেবেন্দ্র বাবু একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। গোঁড়ামী না থাকিলেও ধর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট নিষ্ঠা ছিল, এবং তিনি নীরবে অনাড়ম্বর ভাবেই সে নিষ্ঠা পালন করিয়া যাইতেন। সমাজে তিনি প্রায়ই যাইতেন না, এবং সভাসমিতিতেও বড় একটা যোগ দিতেন না। বক্তৃতাকে তিনি বাচালতা বলিয়াই মনে করিতেন, অথচ কেশব সেনের নামে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিতেন। এই অনাড়ম্বর-প্রিয়তার জন্যই সমাজ দেবেন্দ্র বাবুকে ততটা সম্মান প্রদর্শন করিত না, দেবেন্দ্র বাবুও সমাজের নিকট সম্মানের দাবী রাখিতেন না। ধর্ম্মকে তিনি অন্তরের জিনিষ বলিয়াই মনে করিতেন, বাহিরের লোকের সমালোচনার সহিত তাহার যে কোন সম্বন্ধ আছে, এমন কথা কোন দিন ভাবিতে পারিতেন না।

স্ত্রী করুণাময়ী কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি ছিলেন। ভিতর অপেক্ষা বাহিরটাকেই তিনি আগে দেখিতেন; কোন কার্য্যেই লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। সামাজিক উপাসনায় নিয়মিত যোগদান, সভা সমিতিতে রীতিমত উপস্থিতি, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয় সমূহের আলোচনা, এ সকল তিনি অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন, এবং স্বামীকেও এই সকল কার্য্যের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝাইবার জন্য অনেক সময় সোৎসাহে তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। দেবেন্দ্র বাবু কিন্তু কোন দিনই এই যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইতেন না, স্ত্রীর যুক্তি ও প্রমাণের অখণ্ডনীয়তা স্বীকার

করিয়া লইয়া তর্কযুক্তির উপরে যে একটা আসল বস্তু আছে, নিঃশব্দে তাহাকেই হৃদয় মধ্যে ধারণা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। করুণাময়ী তাঁহার এই গভীর ঔদাস্যে বিরক্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তদীয় ধর্ম্মনিষ্ঠাকে আন্তরিকতাশূন্য ও ব্যর্থ বলিয়া প্রকাশ করিলেও তিনি স্বীয় ধৈর্য্যের আসন হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইতেন না, বরং নীরব গম্ভীর হাস্যে স্ত্রীর সকল ক্রোধ ও বিরক্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিতেন।

দেবেন্দ্র বাবুর তিন কন্যা, এক পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈলবালা বিবাহিতা। সে মাতার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। মধ্যমা মনোরমা কিন্তু পিতার গুণেরই অধিকারিণী হইয়াছিল। পিতার চরিত্র-কেই আদর্শ করিয়া লইয়া সে সর্ব্বদা এই মহান্ আদর্শের অনুকরণ চেষ্টা করিত। এজন্য মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেও সে আপনার কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইত না। মাতা কিন্তু কন্যার এই অস্বাভাবিক শিক্ষার জন্য কন্যা অপেক্ষা তাহার জনককেই অধিক অপরাধী জ্ঞান করিতেন, এবং এই অস্বাভাবিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেকদিন কন্যার সমক্ষেই স্বামীকে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সে তিরস্কারে মনোরমা মস্তক অবনত করিত; দেবেন্দ্র বাবু নীরবে স্নেহকোমল হস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে থাকিতেন।

তারপর মাতা চলিয়া গেলে মনোরমা যখন দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিত, তখন দেবেন্দ্র বাবু স্নেহ-সজল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিতেন, "তোর মায়ের মেজাজটা বড় চড়া, না মনো?"

মনোরমা দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ভিতরের চেয়ে বাহিরটা লোকে এত বড় ক'রে দেখে কেন বাবা?"

দেবেন্দ্র বাবু কন্যার হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া তাহার আঙ্গুলগুলা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ও জিনিষটাও যে দরকারী মা, সংসার হ'তে ওটাকে একেবারে বাদ দিলেও যে চলে না।"

মনোরমা বলিল, "কিন্তু জিনিষটার মূল্য কি বাবা? প্রাণের সঙ্গে তার কতটুকু সম্বন্ধ?"

ধীর গম্ভীর স্বরে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সম্বন্ধ একটু আছে বৈকি; অনেক সময়ে প্রাণটা যে স্তুতি নিন্দায় বিচলিত হয়।"

মনোরমা বলিল, "কিন্তু ধর্ম্ম জিনিষটা কি স্তুতি নিন্দার বাইরে নয়?"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা হ'লেও ঐ সূক্ষ্ম জিনিষটাকে লোকাচারের আবরণ দিয়ে একটু স্থূল ক'রে রাখা দরকার। নতুবা—"

জোরে মাথা নাড়িয়া ঈষৎ রাগতভাবে মনোরমা বলিল, "নতুবা লোকের কাছে বাহবা পাওয়া যায় না, এই তো?"

কন্যার মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তোর বাবার মত তুইও বোধ হয় ও জিনিসটাকে কখন আয়ত্ত করতে পারবি না মনো।"

মনোরমা মৃদু হাসিল।

এইরূপে পিতাপুত্রীর মধ্যে অন্তরে অন্তরে যে একটা উপাস্য উপাসকের গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, মাতার শত চেষ্টাতেও সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল না।

চতুর্দ্দশ অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেও মনোরমা এখনো যেন নিতান্ত বালিকাই ছিল। সাজ সজ্জা বা বেশ ভূষার আড়ম্বরের দিকে তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। মাতার অজস্র তিরস্কার,

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অবিরাম তাড়না, কিছুতেই ইহাতে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। করুণাময়ী এজন্য স্বামীর নিকট অনুযোগ করিলে দেবেন্দ্র বাবু মৃদু হাস্য করিতেন মাত্র।

দেবেন্দ্র বাবুর আর একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। পুত্র অমরনাথের বয়স নয় বৎসর, কনিষ্ঠা কন্যা চারুবালার বয়স সাত বৎসর মাত্র। ক্ষেত্রনাথ ইহাদেরই গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল।

সকালে বিকালে এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার নিয়ম ছিল। ক্ষেত্রনাথ কিন্তু এ নিয়ম মানিযা চলিত না। সে কোন দিন আধ ঘণ্টা থাকিয়াই চলিয়া যাইত, কোন দিন বা দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা বসিয়া পড়াইত। করুণাময়ী কিন্তু ইহা পছন্দ করিতেন না। তিনি নিয়মের কাজকে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিতেই ভালবাসিতেন। সুতরাং ক্ষেত্রনাথের অনিয়মিততায় তিনি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "এ মাষ্টারের দ্বারা কাজ চলবে না, অন্য মাষ্টার দেখ।"

দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এ মাষ্টার কি ভাল পড়াতে পারে না?"

করুণাময়ী বলিলেন, "পড়ালে কি হবে, ও সময়ের মূল্য কিছুমাত্র বুঝে না। সে দিন তো আধ ঘণ্টা পড়িয়েই চলে গেল; কাল আবার দেড় ঘণ্টা ধরে পড়ালে। কাল ঘোষ সাহেবের বাড়ীতে ইভ্নিং পার্টির নিমন্ত্রণ ছিল, সাড়ে পাঁচটায় যাবার কথা, কিন্তু ছ'টাতেও পড়ানো শেষ হয় না। চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা। ওর জন্য আধ ঘণ্টা দেরী হ'য়ে গেল।"

পাঁচ সাত টাকা মাহিনার মাষ্টারের যে এতদূর সময়ের মূল্য বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, দেবেন্দ্রবাবু ইহা নিজে বুঝিলেও পত্নীকে তাহা

বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি শুধু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভাল, অন্য মাষ্টার পাওয়া গেলে ওকে ছাড়িয়ে দিলেই হবে।"

করুণাময়ী চলিয়া গেলে মনোরমা ম্লানমুখে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার মশাইকে ছাড়িয়ে দেবে বাবা?"

দেবেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি নিয়মমত কাজ না করে, তা হ'লে অগত্যা ছাড়াতে হবে বৈকি।"

মনোরমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেবেন্দ্রবাবু কন্যার মনোভাব বুঝিলেন; বুঝিয়া তাহার মুখের উপর কোমল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "যে লোক সময়ের মূল্য জানে না, তাকে রাখা কি ঠিক?"

মৃদু স্বরে মনোরমা বলিল, "উনি কিন্তু বেশ পড়ান।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "শুধু পড়ালে হয় না, সেই সঙ্গে লোকের সুবিধা অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।"

মনোরমা নিরুত্তরে দাড়াইয়া কৌচের হাতলে হাত বুলাইতে লাগিল।

দেবেন্দ্র বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টারকে ছাড়াতে তোর কি অনিচ্ছা মনো?"

নত মুখে সঙ্কুচিত স্বরে মনোরমা বলিল, "ওঁর এই পাঁচটী টাকাই সম্বল বাবা।"

দেবেন্দ্র বাবু স্নিগ্ধ প্রফুল্ল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মনোরমাও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তা আজই তো ছাড়িয়ে দিচ্চি না। আগে একজন ভাল মাষ্টার পাই।"

মনোরমা পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার মশায় পড়াতে এসেছে?"

মনোরমা বলিল, "হাঁ। তিনি সাড়ে চারটার সময় আসেন।"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "পাঁচটা বেজে গেছে। আমার চা হ'লো কিনা দেখ্ মনো।"

মনোরমা চা আনিতে চলিয়া গেল। দেবেন্দ্র বাবু পরিবারবর্গের সহিত চা খাইতেন না। মনোরমা তাঁহার চা প্রস্তুত করিয়া দিত, তিনি স্বতন্ত্র গৃহে বসিয়া তাহা খাইতেন। মনোরমার স্বহস্তে প্রস্তুত চা না খাইলে তাঁহার যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইত না। মনোরমাও যে তাঁহার চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া একটা আন্তরিক তৃপ্তি অনুভব করিত, তাহাও তিনি বুঝিতেন, এবং তজ্জন্য করুণাময়ীর ক্রোধ ও বিরক্তিকে উপেক্ষা করিয়া আপনার চায়ের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই বজায় রাখিয়াছিলেন।

মনোরমা চলিয়া গেলে দেবেন্দ্র বাবু উঠিয়া ধীরে ধীরে ছেলেদের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তখন তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, but ও put শব্দ লইয়া ইংরাজী ইউ অক্ষরের উচ্চারণ এমনই গভীর মনোযোগের সহিত উদাহরণ সহকারে ছাত্রকে বুঝাইতে ব্যস্ত হইয়াছিল যে, দেবেন্দ্র বাবুর গৃহপ্রবেশ তাহার বিছুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। দেবেন্দ্র বাবু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার এই আন্তরিক শিক্ষাদান দর্শন করিতে লাগিলেন।

ছাত্রের মনোযোগ কিন্তু শিক্ষকের ন্যায় গভীর ছিল না, সুতরাং পিতার চটি জুতার শব্দ কাণে আসা অবধি সে একবার দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান পিতার দিকে আরবার শিক্ষকের মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু শিক্ষক যখন আপনার শিক্ষাদান ছাত্রের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বল দেখি, সি ইউ টি (cut) কাট্ না হইয়া কুট্ হইল না কেন?" তখন ছাত্র গভীর সমস্যার মধ্যে নিপতিত

হইয়া ব্যস্তভাবে পাঠ্য পুস্তকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ক্ষেত্রনাথ বিরক্ত-ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেবেন্দ্র বাবুর প্রশান্তগম্ভীর মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিয়া আপনার বিশৃঙ্খল পরিধেয় সুশৃঙ্খল করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্র বাবু মৃদু গম্ভীর হাস্যের সহিত গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

দেবেন্দ্র বাবু আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মনোরমা চা প্রস্তুত করিতেছে। দেবেন্দ্র বাবু কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "তোর মাষ্টার মশায়ের পড়ান শুনে এলাম মনো।"

ব্যগ্র দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলে বাবা?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ছোকরার নিজের আর একটু শিক্ষা থাকলে খুবই ভাল হ'তো।"

মনোরমা চায়ের কাপ লইয়া পিতার সম্মুখে ধরিল। দেবেন্দ্র বাবু তাহার হাত হইতে কাপ্ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার মশায় কি চা খান না?"

মনোরমা বলিল, "কি জানি।"

দেবে। কোন দিন জিজ্ঞাসা করা হয় নি বোধ হয়?

মনো। না।

দেবেন্দ্র বাবু যেন একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করাটা বোধ হয় উচিত ছিল। যদি তার খাওয়া অভ্যাস থাকে, তবে তাকে না দিয়ে খাওয়াটা আমাদের পক্ষে আদৌ উচিত হয় নি।"

লজ্জিত ভাবে মনোরমা বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসচি বাবা।"

মনোরমা ত্বরিতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সভ্যতা ও অসভ্যতা

"আপনি কি চা খাবেন?"

পড়াইবার ঘরে ঢুকিয়া তক্তাপোষের পাশে দাঁড়াইয়া মনোরমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চা খাবেন?"

উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনোরমা যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি চা খাবেন মাষ্টার মশাই?"

ক্ষেত্রনাথ চমকিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল; বলিল, "কা'কে বলচো? আমাকে?"

মনোরমা বলিল, "হাঁ, আপনি কি—"

তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই ক্ষেত্রনাথ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে হাসির শব্দে তাহার ছাত্র ও ছাত্রী চমকিয়া উঠিল, মনোরমা লজ্জিত ভাবে মস্তক নত করিল।

উচ্ছ্বসিত হাস্যের বেগ কতকটা সংবরণ করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আপনি? আপনি কে? আমি আপনি?"

ক্ষেত্রনাথ পুনরায় হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এবার তাহার হাসিটা স্থায়ী হইল না, মনোরমার লজ্জারক্ত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র হাসির বেগটা সহসা থামিয়া গেল। আপনার এই অশিষ্টতা প্রকাশের জন্য যেন একটু লজ্জাও আসিল; সেটাকে চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমাকে কি বলচো?"

মনোরমা নতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন, চা খাবেন ?"

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "চা ? আমি চা খাব ?"

মনোরমা নিরুত্তরে পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা মাটীতে ঠুকিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, আমি পরের ঘরে ভাত খাই, আমার কি চা খেলে চলে ?"

ক্ষেত্রনাথ কথাটা খুব সহজ ভাবে বলিলেও তাহার ভিতর হইতে এমন একটু কাতরতার সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, যাহাতে মনোরমার প্রাণের ভিতর সহানুভূতির সূক্ষ্ম তারটা সে স্বরে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না। সে মুখ তুলিয়া সহানুভূতির কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পরের ঘরে থাকেন ?"

এবারে আপনি সম্বোধনে ক্ষেত্রনাথের আর হাসি আসিল না। সে মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ।"

ঈষৎ কৌতূহলের সহিত মনোরমা বলিল, "নিজের ঘরে থাকেন না কেন ?"

নিজের ঘর ? ক্ষেত্রনাথ আর হাসি চাপিতে পারিল না, সে পুনরায় উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। লজ্জায় মনোরমার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। কিন্তু মুখ ফিরাইতেই দেখিল, দরজার উপর হইতে মাতার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। মাথা নীচু করিয়া মনোরমা দাঁড়াইয়া পড়িল।

করুণাময়ী তখন ক্ষেত্রনাথের দিকে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "এটা চাষার বাড়ী নয় মাষ্টার মশায়, এখানে একটু ভদ্রভাবে চলা দরকার। চারু, তোর পড়া হয়ে থাকে তো আয়।"

ক্ষেত্রনাথ একবার তাঁহার দিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই সম্মুখস্থ পুস্তকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। করুণাময়ী কন্যার দিকে আর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সশব্দ পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। মনোরমা নতমস্তকে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিল।

পিতার গৃহে প্রবেশ করিতেই মনোরমা সভয়ে দেখিল, মাতা ঝড়ের ন্যায় বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় তিনি কন্যার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন। মনোরমা ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পাশে দাঁড়াইল। দেখিল, পিতার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনোরমা ধীরে ধীরে বলিল, "মাষ্টার মশাই চা খান না, বাবা।"

দেবেন্দ্র বাবুর মুখের গাম্ভীর্য্য অপসৃত হইল, মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "অসভ্য চাষায় চা খায় না, মনো।"

মনোরমা নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কিন্তু এরূপ অসভ্য লোক নিয়ে আমাদের মত সভ্যের ঘরে চলে কি?"

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "সরলতার নাম অসভ্যতা, আর কপটতাই কি সভ্যতা বাবা?"

গম্ভীরস্বরে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তাই ব'লে অট্টহাসিও সভ্যতা হ'তে পারে না।"

মনোরমা ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "প্রাণখোলা হাসি যদি সভ্যতা না হয়, তবে আমার মতে জগৎটার অসভ্য হ'য়ে থাকাই দরকার।"

সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তোমার আমার মতে জগৎ চলে না মা, সে জন্য তার একটা স্বতন্ত্র মত, স্বতন্ত্র বিধান আছে।"

মনো। আমি সে বিধানকে গ্রাহ্য করি না, বাবা, আমি চাই তোমার বিচার।

প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেবেন্দ্র বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু বিচারকের নিজস্ব মত থাকে না মনো, সাধারণের মতই তার বিবেকের পরিচালক।"

মনোরমা আর কিছু বলিল না; পিছন দিক্ হইতে চেয়ারের পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল; শুধু একটা লাল আভা পশ্চিম আকাশের খানিকটা জায়গা জুড়িয়া আসন্ন অন্ধকারের বেদনা পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল; একখানা ছোট মেঘ দিনের সেই শেষ আলোটুকু বুকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল। বসন্তের শেষ স্মৃতিস্বরূপ দুই চারিটা ফুল লইয়া যুঁই গাছটা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। টবে একটা বেলফুলের ঝাড়ে কয়েকটা ফুল ফুটিয়াছিল; তাহারই একটু একটু গন্ধ আসিয়া পাখার বাতাসে ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মনোরমা স্থির দৃষ্টিতে আকাশের যেখানে লাল আভার পাশে অন্ধকারের কালো ছায়া ধীরে ধীরে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়াছিল।

"পাখাটা বন্ধ করে দে তো মনো।"

মনোরমা ধীরে ধীরে গিয়া সুইচ্ টিপিয়া দিল। পাখা বন্ধ হইল। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "চল্, একটু ছাদে যাই।"

দেবেন্দ্রবাবু উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হ্যাট কোট পরিহিত এক নব্য যুবক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রবাবু প্রতি নমস্কার করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবকের

মুখের দিকে চাহিলেন। যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পাচ্চেন না?"

দেবেন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, যামিনী! তুমি বিলেত থেকে ফিরলে কবে? ব'সো।"

ছড়ি গাছটা টেবিলের উপর রাখিয়া যামিনী একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া উত্তর দিল, "লাষ্ট উইকে (গত সপ্তাহে) ফিরেছি। মণ্ডে মর্নিংএ সোমবার প্রাতে) ক্যালকাটায় (কলিকাতায়) পৌছেছি।"

দেবেন্দ্র বাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যামিনীকে চিনিস্ না মনো! বনমালী বাবুর ছেলে। ওদের বাড়ীতে যে তোরা অনেকবার গিয়েছিস্। যামিনী বিলেত গিয়েছিল ব্যারিষ্টার হ'তে।"

মনোরমা মাতার সহিত দুই চারিবার বনমালী বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেও যামিনীর সহিত তাহার কখন চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই; কখন সাক্ষাৎ হইলেও সেটা তাহার মনে ছিল না। পিতার কথায় সে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া যামিনীকে নমস্কার করিলে, যামিনীও সহাস্যে প্রতি নমস্কার করিল।

দেবেন্দ্র বাবু অতঃপর যামিনীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খবর কি? সার্টফিকেট পেয়েছো?"

গর্ব্বপ্রফুল্লমুখে যামিনী বলিল, "সার্টেন্‌লি (নিশ্চয়)।"

আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু তাহার পিতার কুশল সংবাদ লইলেন। তারপর বিলাতের কথা পড়িল। সেখানকার শিক্ষা দীক্ষার কথা, আচার ব্যবহারের কথা, ভারতের সহিত ইংল্যাণ্ডের তুলনায় সমালোচনা প্রভৃতি অনেক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মনোরমা সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনুরক্তা ও বিরক্তা

দেবেন্দ্র বাবু যখন দেখিলেন, এই ক্ষুদ্র মাষ্টারটীকে লইয়া তাঁহার শান্তিপ্রিয়তার সম্পূর্ণ বাধা উপস্থিত হইয়াছে, এবং এই গোঁড়া হিন্দু শিক্ষকের শিক্ষায় ছেলে মেয়েদের স্বভাব চরিত্র দূষিত হইবার আশঙ্কায় করুণাময়ী একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি এই অনাথ যুবকটীকে শিক্ষকের পদ হইতে অপসৃত করা ছাড়া অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু পিতার অভিপ্রায় শ্রবণে মনোরমা যখন ছলছল চোখে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবা, ধর্ম্ম রক্ষার ভাণে এটা কি ধর্ম্মের উদারতার উপরে আঘাত করা হয় না ?"

দেবেন্দ্র বাবু তখন কন্যার এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, তথাপি একটা বাজে উত্তর দিয়া কন্যাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "ধর্ম্ম জিনিষটাকে সকল দিক্ দিয়েই যে বজায় রাখা দরকার মা, সে জন্য এক আধটু কঠোরতা অবলম্বন না করলে চলবে কেন ?"

মনোরমাও পিতার এই উত্তরের ভিত্তিহীনতা বুঝিতে পারিল ; সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তা হলে দেখছি বাবা, ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের ছোঁয়াছুঁয়িটাও ব্রাহ্মধর্ম্মে এসে পড়বে।"

দেবেন্দ্র বাবুও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আসে, ক্ষতি কি ?"

মনোরমা বলিল, "ক্ষতি এই যে, তা হ'লে অনেক আচার্য্যের হিন্দু ধর্ম্মকে গালাগালি দেওয়ার সুযোগ আর থাকবে না।"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন,

'তা হ'লে তোর একটা পরম লাভ হবে, মন্দিরে গিয়ে আচার্য্যের বক্তৃতা শুনতে তোর আর কোন বাধা থাকবে না।"

কথা শেষ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মনোরমা পিতার চেয়ারের হাতলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ঈষৎ কাতরতা-পূর্ণস্বরে বলিল, "না বাবা, ধর্ম্ম জিনিষটাকে আমি সব চেয়ে উঁচু দেখি; তার ভিতর থেকে সঙ্কীর্ণতা দেখবার আশা আমি করি না।"

মেয়ের মাথাটাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া দেবেন্দ্র বাবু শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সত্যি মনো, ঐ সব চেয়ে উঁচু জিনিষটাকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে এনে নীচু ক'রে ফেলা, সেটা আমারও সম্পূর্ণ বিবেকবিরুদ্ধ। কিন্তু মা—"

পিতার গাঢ় কণ্ঠস্বরে মনোরমা বুঝিতে পারিল, এই বিবেকবিরুদ্ধ কাজটা নীরবে সম্পন্ন করিতে পিতা হৃদয়ে কি গভীর আঘাত পাইয়াছেন। সে জন্তে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল; পিতার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা হ'তেই পারে না বাবা, যা তোমার বিবেকের বিরুদ্ধ, কারো জন্যেই, কোন কিছুর অনুরোধেই তা তুমি করতে পার না।"

দেবেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই হাসিটুকুর অন্তরালে যে একটা গভীর বেদনা লুক্কায়িত ছিল, তাহা মনোরমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পিতার কোলের উপর মাথা রাখিল; দেবেন্দ্র বাবু স্নেহ-কোমল হাতখানি দিয়া তাহার মাথার চুলের ভিতর ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

কতকক্ষণ নীরবে থাকিয়া দেবেন্দ্র বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "এক কাজ করলে হয় না মা?"

মনোরমা মুখ তুলিয়া সাগ্রহে পিতার মুখের দিকে চাহিল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ছোকরার বুদ্ধি আছে, অধ্যবসায় আছে; চেষ্টা করলে উন্নতি করতে পারে।"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "চাকরীতে?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সেটা উন্নতি নয়—অবনতি। আমি পড়া শোনার কথা বলছি।"

ব্যগ্র কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "তুমি পড়াবে বাবা?"

সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তুই এক পাগল! পড়াবার খরচ কত! ও আমার কে, যে সে গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে যাব।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া মনোরমা অর্থহীন দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "যাতে ওর পড়া হয়, আমি সে চেষ্টা দেখতে পারি।"

সহর্ষে মনোরমা বলিয়া উঠিল, "তা হ'লেই হবে বাবা।"

দেবে। কিন্তু ওর কি তাতে মত হবে?

মনো। খুব হবে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

মনোরমা ব্যস্তভাবে উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। দেবেন্দ্র বাবু তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আজ থাক, একটু ভেবে দেখি।"

মনোরমা নিরস্ত হইয়া ধীরে ধীরে গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল; দেবেন্দ্র বাবু টেবিলের উপর হইতে একখানা বাঁধান ইংরাজী বহি লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। দেবেন্দ্র বাবু পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সকালে কি যামিনী এসেছিল?"

মুখ না ফিরাইয়াই মনোরমা উত্তর দিল, "কৈ, না।"

দেবেন্দ্রবাবু পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। মনোরমা জানালার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবা, যামিনীবাবু আজকাল এত ঘন ঘন যাতায়াত করে কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া দেবেন্দ্রবাবু উত্তর করিলেন, "আত্মীয়তা থাকলেই লোকে যাতায়াত করে। তাতে কোন দোষ হ'তে পারে না।"

মনো। দোষ না হোক্, কিন্তু তোমার সঙ্গে এত তর্ক ক'রে কেন?

দেবে। সত্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি থাকলেই লোকে তর্ক ক'রে থাকে।

মনো। কৈ, তুমি তো তর্ক কর না?

দেবে। মানুষ চিরকালই তর্ক করে না মা, প্রথম প্রথম খুব তর্ক-বিতর্ক করে, আপনার মত বজায় রাখবার জন্য খুব দৃঢ়তা দেখায়। তারপর যখন দেখে, তর্ক আর সত্য এ দু'টা ঠিক বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী, তখন একেবারে চুপ হ'য়ে যায়।

একটু নীরব থাকিয়া মনোরমা বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, সত্যের অনুসন্ধান যামিনীবাবুর তর্কের উদ্দেশ্য নয়।"

বিস্মিতভাবে দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি উদ্দেশ্য?"

মনোরমা বলিল, "উদ্দেশ্য, নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন।"

কন্যার সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবু মুগ্ধ প্রশংসমান নেত্রে তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন।

বাস্তবিকই নবীন ব্যারিষ্টার যামিনীনাথের যাতায়াতটা এবাড়ীতে একটু বেশী মাত্রাতেই হইতেছিল। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও আসিয়া সে দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিত; এবং যখনই আসিত,

তখনই দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, দেশহিতৈষিতার সার্থকতা প্রভৃতি একটা না একটা বিষয় লইয়া এমন সকল তর্কের অবতারণা করিত, যাহাকে দেবেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারিতেন না। তথাপি তিনি যথোচিত ধৈর্য্য সহকারে এই নবীন তার্কিকের কূট প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। তিনি যামিনীনাথের এরূপ নিষ্ফল তর্কের কারণও বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তবে মনোরমা যাহা বুঝিয়াছিল, তিনি সেরূপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এইরূপে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন দ্বারা মনোরমার অনুরাগ আকর্ষণই যামিনীনাথের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই অসার তর্ক-যুদ্ধই যে তাহার সে উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাড়াইতেছে, অনুরাগের পরিবর্ত্তে সে যে মনোরমার বিরাগভাজন হইয়াই পড়িতেছে এটুকু দেবেন্দ্রবাবু বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যামিনীনাথ তাহা বুঝিতে পারে নাই; তাই সে তর্ক-যুদ্ধ দ্বারা মনোরমার হৃদয়দুর্গ জয়ের আশায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যে কোন্ দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে এটুকু লক্ষ্য করিবার অবসর তাহার ছিল না। এই আশামুগ্ধ যুবকের ভাবি নিষ্ফলতা স্মরণে দেবেন্দ্রবাবুর চিত্ত সময়ে সময়ে করুণায় বিগলিত হইত।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মনোরমা বলিল, "আচ্ছা বাবা, যামিনী বাবু কথা কইতে গিয়ে বাংলা ইংরাজী মিশিয়ে কথা কয় কেন?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ওটা অভ্যাসের দোষ। ইংরাজী একটু বেশী পড়লে ঐ ভাষাটা আপনা হ'তেই বেরিয়ে আসে।"

ঘাড় নাড়িয়া মনোরমা বলিল, "কৈ, তোমার মুখ দিয়ে তো বা'র হয় না বাবা? যামিনী বাবু কি ইংরাজীতে তোমার চেয়ে বেশী পণ্ডিত?"

দেবেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সকল কথার মধ্যেই তোর বাবার তুলনা টেনে আনলে আমি পেরে উঠবো কেন? কথাবার্ত্তা কওয়া আর কিছু নয়, শুধু অভ্যাস। আমি ছেলে বেলা হ'তে বাংলাকে বাংলার মতই বলবার চেষ্টা ক'রে আসছি, কাজেই তার সঙ্গে ইংরাজী বরোয় না।"

মনোরমা বলিল, "আমার কিন্তু বাবা, ওরকম কথা বড় বিশ্রী বোধ

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ওরা কিন্তু বলেন, বাংলা ভাষার দৈন্যের জন্যই ইংরাজীতে মনোভাব প্রকাশ করতে হয়।"

ক্রুদ্ধ স্বরে মনোরমা বলিল, "সেটা বাংলা ভাষার দৈন্যের জন্য নয়, তাদের শিক্ষার দৈন্যের জন্য। আমার এমন ইচ্ছা হয় বাবা, যামিনী বাবুকে ডেকে বলি, আগে বাংলা ভাষাটা শিখে এস।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যামিনীনাথ কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মনোরমার দিকে চাহিয়া করুণ হাস্যের সহিত বলিলেন, "অন্‌উইলিংলি (অনিচ্ছাসত্ত্বে) আপনার অ্যাড্‌ভাইস্‌ (উপদেশ) শুনে আমি ধন্য হ'লেও এ জন্য আপনার কাছে মাপ চাইছি। ফিউচারে (ভবিষ্যতে) আমি পিওর বেঙ্গলা (বিশুদ্ধ বাঙ্গালা) ইউজ (ব্যবহার) করবার জন্য ট্রাই (চেষ্টা) করবো।"

মনোরমা লজ্জায় মস্তক নত করিল, কিন্তু একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

দেবেন্দ্রবাবু তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া যামিনীনাথ বলিলেন, "আপনাদের প্রাইভেট মাষ্টারের নাম কি ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী?"

দেবেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

যামিনীনাথ বলিলেন, "ছোকরা পুলিস হাঙ্গামে পড়ে জামীনের জন্য আপনার কাছে আসিয়াছিল।"

"পুলিস হাঙ্গাম" বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে যামিনীনাথের দিকে চাহিলেন। মনোরমাও তাঁহার মুখের উপর উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যামিনীনাথ তখন পুলিস হাঙ্গামের কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিলেন। ঠনৃঠনিয়ার এক মুসলমান জুতাওয়ালার দোকানে জুতার দাম লইয়া খরিদদারের সহিত দোকানদারের বচসা হয় শেষে দোকানদার বেচারা খরিদদারকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। ক্ষেত্রনাথ তখন সেইখান দিয়া পড়াইতে আসিতেছিল। সে এই অন্যায় প্রহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। তাহাতে ক্ষেত্রনাথের সহিত দোকানদারের বিবাদ বাধিয়া যায়। দোকানদার তাহার প্রতি কটূক্তি করে। ক্ষেত্রনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া দোকানে উঠিয়া দোকানদারকে প্রহার দেয়। দোকানদার তাহাকে ধরিয়া মার পিট এবং দোকান লুট করার অভিযোগে পুলিশের হাতে দিয়াছে।

বর্ণনা শেষ করিয়া যামিনীনাথ বলিলেন, "ছোকরা পুলিসের কাছে আপনার নাম করে, এবং আপনি যে জামীন হ'য়ে তাকে মুক্ত করতে পারবেন এ কথাও বলে। এ জন্য পুলিশ তাকে নিয়ে আপনার এখানে আসছিল।"

মনোরমা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

যামিনীনাথ ঈষৎ গর্ব্বপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "ফরচুনেট্‌লি (সৌভাগ্যক্রমে) ঠিক সেই সময় আমিও এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি পুলিশকে বুঝিয়ে দিলাম, এরূপ অসভ্য গুণ্ডামির জন্য দেবেন্দ্রবাবুর ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তি জামিন হ'তে পারেন না।"

মনোরমা তাঁহার উপর ভ্রূকুটীপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল। দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে পুলিশ তাকে নিয়ে চলে গিয়েছে?"

যামিনীনাথ বলিলেন, "হাঁ, তারা চলে গেলে আমি উপরে এসেছি।"

দেবেন্দ্রবাবু গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন। মনোরমা ঈষৎ ব্যাকুলতাপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

কন্যার আহ্বানে কোন উত্তর না দিয়া দেবেন্দ্র বাবু ভৃত্য বৈজুকে ডাকিয়া অবিলম্বে গাড়ী জুতিবার আদেশ দিলেন। যামিনীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বাইরে যাবেন এখন?"

দেবেন্দ্র বাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাঁ, থানায় যেতে হবে।"

সবিস্ময়ে যামিনীনাথ বলিয়া উঠিলেন, "জামিনের জন্য?"

"হাঁ" বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু বস্ত্র পরিবর্ত্তন জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যামিনীনাথ বলিলেন, "আমি কিন্তু আশা করি না যে, এই গুণ্ডামীর ব্যাপারে আপনি জামিন হবেন।"

মনোরমা তীব্রস্বরে বলিল, "অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াকে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তিই হীন গুণ্ডামি আখ্যায় অভিহিত করতে পারে না।"

যামিনীনাথের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রবাবু কাপড় ছাড়িতে চলিলেন। দরজার কাছে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং যামিনীনাথের দিকে চাহিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, "আমার ফিরতে বেশী বিলম্ব হবে না, ততক্ষণ তুমি মনোর সঙ্গে গল্প করতে পার, অথবা ও ঘরে—"

বাধা দিয়া যামিনীনাথ ঈষৎ লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "যদি প্রয়োজন হয়, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি।"

"নিষ্প্রয়োজন" বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলেন। যামিনীনাথ নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় নির্ব্বাকভাবে নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। চোখ তুলিয়া মনোরমার দিকে চাহিতেও সাহস হইল না। মনোরমাও তাঁহার এই লজ্জার গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া যেন তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার জন্যই তাঁহার দৃষ্টির বিপরীত দিকে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

তারপর দরজা হইতে গাড়ীর গড় গড় শব্দ উঠিয়া ক্রমে তাহা যখন মিলাইয়া গেল, তখন যামিনীনাথ ছড়িগাছটা তুলিয়া লইয়া টুপিটা মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় মনোরমাকে একটা বিদায় নমস্কার করিয়া যাইতেও ভুলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

খেতুর খোরাকী

দুর্গাদেবী দেবরকে বলিলেন, “হাঁ ঠাকুরপো, খেতু যদি পড়ে, ওর খাওয়া পরার খরচটা দেবে ?”

একটু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে যতীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও আবার কি পড়বে ?”

দুর্গাদেবী বলিলেন, “পাশের পড়া পড়বে।”

যতী। পড়ার খরচ যোগাবে কে ?

দুর্গা। ও যাঁর ছেলেকে পড়ায়, তিনি নাকি সে ভার নিয়েছেন।

যতী। কে, দেবেন বাবু ?

দুর্গা। তাঁর নাম কি দেবেন বাবু ?

যতী। হাঁ। ওর জন্যে তাঁর এত মাথাব্যথা কেন ?

দুর্গা। তিনি নাকি ওর স্বভাব চরিত্র দেখে খুব খুসী হয়েছেন ; বলেছেন, আরো পড়াশোনা করলে খুব বড়লোক হবে।

বিরক্তভাবে যতীন বাবু বলিলেন, “ছাই হবে।”

দুর্গাদেবী চুপ করিয়া রহিলেন। একটু থামিয়া যতীন বাবু বলিলেন, “তা দেবেন বাবু যখন পড়ার খরচের ভার নিলেন, তখন খাওয়ার খরচের ভারটা নিলেও তো পারতেন ?”

দুর্গা। পরে আর কত ভার নেবে বল।

যতী। আমিই বা কি এমন আপন ?

মস্তক সঞ্চালন করিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, “একটু সুবাদ আছে

বৈকি। নয় তো সহরে এত লোক থাকতে আমাদের কাছেই বা এসে পড়বে কেন ?”

গম্ভীরস্বরে “হুঁ” বলিয়া যতীন বাবু হিসাবের খাতায় মনোনিবেশ করিলেন। দুর্গাদেবী একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল ?”

ব্রজসুন্দরী আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “বলাবলি আবার কি, একটু হিসেব ক’রে কথা কইলেই হয়। সহরে একটা লোকের খেতে কত পড়ে ?”

দরজার দিকে চাহিয়া ঈষৎ রুষ্টস্বরে দুর্গাদেবী বলিলেন, “পাঁচশো টাকা পড়ে। ভাতের হাঁড়ির ভাত খাবে, তার আবার পড়াপড়ি কি।”

ব্রজসুন্দরী মৃদু অথচ একটু চিবানো স্বরে বলিলেন, “ভাতের হাঁড়াতে ভাতটা তো অমনি আসে না ?”

তর্জ্জন করিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, “না, তুই রোজগার ক’রে এনে দিস্। দেখ্ ছোট বৌ, অমন সব কথা মনে আনিস না বলছি। ভগবান করুন, আমার যতীন রোজ পাঁচশো লোকের পাতে ভাত দিক্, দেখে আমার চক্ষু সার্থক হোক্।”

ব্রজসুন্দরী অলক্ষ্যে বিকৃত মুখভঙ্গী করিলেন। যতীন বাবু হিসাবের খাতা হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন, “গেল মাসে কত খরচ হ’য়েছে জান ? এক শো সাত টাকা তের আনা।”

গর্ব্বপ্রদীপ্ত কণ্ঠে দুর্গাদেবী বলিলেন, “আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তোর মাসে সাত শো সাত টাকা খরচ হোক্।”

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া যতীন বাবু বলিলেন, “কিন্তু পুঁটী দশ বছরে পা দিয়েছে তা জান ?”

ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে দুর্গাদেবী বলিলেন, "না, আমি আর তা কি ক'রে জানব। যা ভাবছিস্ তুই। কেন না তুই এখন কর্ত্তা হ'য়ে পড়েছিস্।"

ধীর গম্ভীর স্বরে যতীন বাবু বলিলেন, "রাগ কর কেন বৌদি, জানছো তো বটে, কিন্তু আর এক বছর পরেই যে অন্ততঃ তিনটী হাজার টাকা চাই, তার কি ? টাকাগুলা কি আসমান হ'তে আসবে ?"

ক্রোধপ্রদীপ্ত কণ্ঠে দুর্গাদেবী বলিলেন, "না, তুই এনে দিবি। দেখ্ যতীন, তোর মনে পড়ে না, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, যে বছর তিনি মারা যান, সেই বছর একদিন চালের অভাবে খুদ রেঁধে গুড় মেখে তোকে পায়েস ব'লে খেতে দিয়েছিলাম। তুই মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলি, এ আবার কি পায়েস বৌদি ? আমি বলেছিলাম, এ এক রকম নতুন পায়েস, খেতে হয়। সে দিন আমি একবারও ভাবি নাই যে, তুই মাসে মাসে এমন আঁজলা ভ'রে টাকা আনবি।"

অতীত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে দুর্গাদেবীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। যতীন বাবু ডান হাতে কলমটা ধরিয়া বাঁ হাতের আঙ্গুল গুলা মাথার চুলের ভিতর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দুর্গাদেবী একটু থামিয়া দেবরের মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ভগবান্ মানুষকে অনেক দেন যতীন, কিন্তু যে মানুষ তাঁর দানের এক কণাও মানুষকে দিতে কাতর হয়, তার মত হতভাগা আর নাই।"

দুর্গাদেবী ক্রোধগম্ভীর পদক্ষেপে গৃহের বাহিরে আসিলেন। যতীন ডাকিয়া বলিলেন, "শোন।"

দুর্গাদেবী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যতীন বাবু বলিলেন, "তোমার যখন ওকে রাখতে জেদ হ'য়েছে—"

বাধা দিয়া রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে দুর্গাদেবী বলিলেন, "আমার একটুও জেদ

নাই। তোদের কুটুম্বের ছেলে, তোরা যদি না রাখিস্, এক মুঠো ভাত দিলে তোদের যদি এতই কষ্ট হয়, তবে আমার তাতে কি!"

দুর্গাদেবী দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। যতীন বাবু একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া পুনরায় হিসাবের খাতায় মনঃসংযোগ করিলেন বড় গিন্নীর রাগ দেখিয়া ব্রজসুন্দরী পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

রাত্রিতে ক্ষেত্রনাথ আসিয়া দুর্গাদেবীকে বলিলেন, "সব ঠিক হ'য়ে গেল জেঠাইমা, বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হব। দেবেন বাবু ফ্রি ক'রে দিয়েছেন। বই টই যা দরকার হবে তিনিই দেবেন। কাল রবিবার, সোমবার থেকে ভর্ত্তি হব।"

তাহার এই উৎসাহ দেখিয়া জেঠাইমা বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "ভর্ত্তি তো হবি, কিন্তু—"

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "না জেঠাই মা, এবার আমি দস্তুরমত পড়া শোনা করবো, এ তুমি দেখে নিও। গোটা দুই পাশ আমাকে কত্তেই হবে। তা নৈলে ধর না, কত কাল পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকবো? বেটা ছেলে, সংসারধর্ম্ম কত্তে হবে, তার কিনারা তো করা চাই। এখন আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি জেঠাইমা, স্কুল পালিয়ে আগে কি আহাম্মুকিই করেছি। কিন্তু আর নয়, এবার উঠে পড়ে লাগতে হবে আর সুবিধেও আছে, এখানে মাছ ধরবার মত পুকুরও নাই, শালিক পাখীর বাসাও নাই।"

কথা শেষ করিয়াই ক্ষেত্রনাথ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে জেঠাইমাও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। খানিকটা হাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "লোক বলতে হয় তো দেবেন বাবুকে। ধর না জেঠাইমা, আমি তাঁর কে। তবু আমাকে

পড়াবার জন্য তাঁর কত আগ্রহ। ব্রাহ্ম হ'লে কি হয়, মানুষের মত মানুষ। যেমন চেহারা, তেমনি কথা, তেমনি পরোপকারী। দেখলে ভক্তি হয় জেঠাইমা। আবার যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে।"

"কোন্ মেয়ে? যেটাকে পড়াস্?"

"আহা, সে কেন, সে তো বছর সাতেকের মেয়ে। এটা বোধ হয় বড়। বড় কি মেজো ঠিক জানি না।"

"বয়স কত?"

"বছর ষোল হবে।"

"বিয়ে হ'য়েছে?"

ঘাড় নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "উহুঁ, ওরা যে ব্রাহ্ম। ওদের ঘরে কি আমাদের মত দশ এগার বছরে মেয়ের বিয়ে হয়?"

জেঠাইমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে। মেয়েটা দেখতে কেমন?"

মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে ক্ষেত্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখতে মন্দ নয়, তবে খুব সুন্দরীও বলা যায় না। কিন্তু সব চেয়ে মিষ্টি ওর কথাগুলি। এমন ধীরে ধীরে মুখটা নীচু ক'রে আপনি মশায় ব'লে কথা কয় যে, শুনলে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।"

সহাস্যে জেঠাই মা বলিলেন, "দেখিস্, তোর সঙ্গে যেন মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেলে না।"

ক্ষেত্রনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "কও কথা জেঠাই মা, তারা হ'লো ব্রাহ্ম, আমি হ'লাম হিন্দু, তা ছাড়া সে হ'লো লাখপতির মেয়ে, আর আমার চাল নাই চুলো নাই, আমার সঙ্গে বিয়ে!"

হাস্যের সহিত আরম্ভ হইলেও কথাটার উপসংহারে ক্ষেত্রনাথের অজ্ঞাতসারেই যে তাহার মুখখানায় বিষাদের একটা ছায়া পড়িল জেঠাই মা তাহা লক্ষ্য করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয় লইয়া বলিল, "যাক্, এখন কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে গেলে তবে নিশ্চিন্ত হই ভর্ত্তি হ'য়ে দাদামশায়কে একখানা চিঠী লিখতে হবে।"

জেঠাইমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা তোর দাদামশায়কে খোরাকীর টাকা চাইলে কি দেয় না?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "দেয় না যে এমন কথ বলতে পারি না জেঠাইমা, চাইলে তক্ষুনি দেবে। বুড়ো এদিকে যাই হোক প্রাণটা বড্ডই নরম। তবে কি জান, টাকা দেবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন পাঁচ কথা শুনিয়ে দেবে—না জেঠাইমা, তা আমি পারব না। আ দরকারই বা কি, তুমি যা হয় দু'বেলা দু'মুঠো দিলেই ব্যস্।"

"যদি না দিই?"

"কে দেবে না, তুমি?"

ক্ষেত্রনাথ পুনরায় হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল। ব্রজসুন্দরী সম্মুখে আসিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কিগো, রেতের বেলায় এত হাসি ধুম কেন?"

মাসীমাকে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সব ঠিক হ'য়ে গেছে মাসীমা, পরশু থেকে কলেজে ভর্ত্তি হচ্চি।"

হাত দুইটা উপরদিকে তুলিয়া একটা আলস্য ভাঙ্গিয়া ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "তা তো হচ্চো, তবে উনি বলছিলেন—"

দুর্গাদেবী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি যে কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারেন নাই, ছোট বৌ যে সেই কথাটাই এখনি নির্ম্মমতাে

শুনাইয়া দিবে ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কথাটায় চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি শুষ্কমুখে বলিলেন, "খেতু, এক কাজ করতে পারিস বাবা, দোকান থেকে গুড় এক পোয়া এনে দিতে পারিস? বিকেলে চাকরটা দোকানে গেল, তা পোড়া মনে হ'লো না।"

ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "রাত্রে গুড় কি হবে?"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "আমাকে একটু জল খেতে হবে না? আর কাল সকালেই তো রান্নায় চাই।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "রাত প্রায় দশটা বাজে, দোকান কি খোলা আছে?"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "আছে, আছে, গিয়েই দেখ্ না। আয়, বাটী আর পয়সা দিই।"

ক্ষেত্রনাথকে ডাকিয়া লইয়া দুর্গাদেবী চলিয়া গেলেন। ব্রজসুন্দরী মনের কথাটা প্রকাশ করিতে না পারিয়া গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

খেতুকে দোকানে পাঠাইয়া দিয়া ব্রজসুন্দরীর সম্মুখে আসিয়া দুর্গাদেবী তিরস্কারের সহিত বলিলেন, "তোর রকম কি ছোট বৌ, ওদের কি আর তর্ সয় না?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "আমিও তো তাই বলি, এত রাত্রে দিদির গুড়ের দরকার পড়লো কেন?"

তর্জন করিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "কেন তা তুই কি বুঝবি বল্। দেখ্ ছোট বৌ, লোক লক্ষ্মী, কার ভাগ্যে কে খায় তা কি কেউ বলতে পারে।"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "তা আমারই এত বলাবলির দরকার কি। তোমার দেওর বলছিলেন, তাই।"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "তা বলুক, সে যদি পাগল হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে কি বাড়ীশুদ্ধ পাগল হ'তে হবে ?"

তীব্র বিদ্রূপের স্বরে ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "যে বুক কুটে পয়সা আনচে, সে পাগল কি ছাগল তা তুমিই বুঝে দেখ গে।"

অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে দুর্গাদেবী বলিলেন, "আমি সব বুঝি ছোট বৌ কিন্তু আমি যোড়হাত করে বলছি, ওকে তোরা কেউ কিছু বলিস্ না। ও যদি তোদের এতই ভার হয়ে থাকে, আমার তো সোনাদানা দুখানা আছে, আমি তাই বেচে ওর খোরাকীর টাকা দেব।"

বিস্ময়সূচকস্বরে "ওঃ" বলিয়া ব্রজসুন্দরী ধীরে ধীরে আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন। দুর্গাদেবী খেতুর ভাত বাড়িবার জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

খেতুর পাঠস্পৃহা

অনেক দিনের তামাদিপ্রায় দেনা পাওনার কথাটা হঠাৎ মনে পড়িলে চতুর মহাজন যেমন তাড়াতাড়ি সুদ আসল সমেত পাওনাটা আদায় করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, ক্ষেত্রনাথও তেমনই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া এত দিনের অমনোযোগিতাজনিত ক্ষতিটাকে সুদে আসলে পোষাইয়া লইবার জন্য এমনই উঠিয়া পড়িয়া লাগিল যে, তাহার এই অদ্ভুত পাঠানুরাগ দর্শনে ব্রজসুন্দরী পর্য্যন্ত বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রনাথ যেন এক দিনেই পাঠ্যপুস্তকগুলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। দুর্গা দেবী ইহাতে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু আহার নিদ্রার অনিয়মে পাছে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এজন্য একটু বিরক্তও হইলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে খেতু, তুই একদিনে পণ্ডিত হ'তে চাস্ নাকি ?"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "তা যদি পারতাম জেঠাই মা, তবে সে কি চমৎকারই হ'তো।"

জেঠাই মা হাসিয়া বলিলেন, "তাই বুঝি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ছেড়ে সদ্য সদ্য কালিদাস হ'বার চেষ্টায় আছিস্ ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কাজেই। বিদ্যাটা অনেক পিছনে পড়ে থাকলেও বয়সটা যে খুব এগিয়ে গিয়েছে জেঠাই মা। এখন কি আর ধীরে সুস্থে পড়বার সময় আছে ?"

জেঠাই। কিন্তু তার ভেতর খাওয়া দাওয়ার জন্যও তো একটু সময় দিতে হবে।

ক্ষেত্র। সে সময় আগে যথেষ্ট দিয়েছি, পরেও যথেষ্ট দিতে পারবো মাঝে দিন কতক না হয় একটু কমই দিলাম।

জেঠাই মা ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন, "তা দিলে চলবে না। গরম ভাত ঠাণ্ডা হয়, ডাল তরকারী টক্ হ'য়ে যায়।"

মাথা নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "হ'লেই বা টক্, আমার খাওয়া তে আটকায় না।"

তর্জ্জন করিয়া জেঠাই মা বলিলেন, "কিন্তু রাত একটা পর্য্যন্ত কে তোর ভাত আগলে থাকে বল্ তো?"

"তুমি" বলিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রনাথের এই অসাধারণ পাঠানুরাগ দেখিয়া যতীনবাবু কিছু বলিলেন না; কিন্তু ব্রজসুন্দরীর এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য হইল না। যদিও ক্ষেত্রনাথ এ পর্য্যন্ত সংসারের কোন কাজের সম্পর্কেই থাকিত না, তথাপি ব্রজসুন্দরী ইদানীং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "এমন পড়াও বাপের জন্মে দেখি না বাবু, গেরস্ত ঘরের ছেলের এমন দিনরাত বইয়ে মুখ থাকলে কি সংসার চলে? সবটাই অন্যায়।"

এই অন্যায়টা যাহাতে অতিরিক্ত না হয় তজ্জন্য ব্রজসুন্দরী ইদানীং মধ্যে মধ্যে তাহাকে দুই একটা সাংসারিক কাজের ফরমাইসও করিতেন ক্ষেত্রনাথ কোনটা পালন করিত, কোনটা বা করিত না। ব্রজসুন্দরী তাহার অসাক্ষাতে অথচ তাহার শ্রুতিগোচর হয় এমন ভাবে একটু চড় গলায় বলিতেন, "কালে ভদ্রে দোকান যাওয়া, বাজার করা, এটাও যদি না করবে, তবে খাওয়াটা হবে কোথা হ'তে?"

ক্ষেত্রনাথ মাথা নীচু করিয়া পাঠে গভীর মনঃসংযোগ দিবার চেষ্টা করিত। দুর্গাদেবী বলিতেন, "কেন এমন সব কথা বলিস্ ছোট বৌ ?"

ব্রজসুন্দরী বিরক্তির সহিত উত্তর করিতেন, "সাধে কি বলি, লোকে বিবেচনা না ক'রে কাজ করলেই বলতে হয়। আমার এত অসৈরণ সহ্য হয় না।"

দুর্গাদেবী চুপ করিয়া থাকিতেন। ব্রজসুন্দরী কিন্তু এত সহজে নিরস্ত হইতে পারিতেন না। বড় ছেলে ধীরেন স্কুলে নূতন ভর্ত্তি হইয়াছিল। সে পড়া করিতে বসিলে ব্রজসুন্দরী তাহাকে বলিতেন, "এখানে ব'সে কি ও সব পড়ছিস্ ? বাইরের ঘরে তোর খেতা দাদা পড়ছে, তার কাছে গিয়ে পড়াটা ব'লে নে না।"

মাতার তাড়নায় ধীরেন অগত্যা ক্ষেত্রনাথের নিকট পড়িতে যাইত। কিন্তু অমনোযোগিতার জন্য যদি মার খাইয়া কাঁদিত, তাহা হইলে ব্রজসুন্দরী ছেলেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "হতভাগা ছেলে, কেন তোর ওর কাছে যাওয়া ? ও আপনার পড়া নিয়েই ব্যস্ত, তোকে আবার পড়াবে।"

তারপর দুর্গাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া সক্ষোভে বলিতেন, "দেখলে দিদি, ছেলেটা পড়তে গেছলো ব'লে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে।"

দুর্গাদেবী ধীরেনকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেন তোকে মেরেছে রে ধীরে ?"

মায়ের কাছে মিথ্যা বলিলেও জেঠাইমার কাছে মিথ্যা বলিবার সাহস ধীরেনের ছিল না। সুতরাং সে হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ভয়ে ভয়ে বলিল, "পড়া বলতে পারি না, তাই—"

দুর্গাদেবী ছোট বোয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা পড়া বলতে না পারলে মারবে না তো কি করবে ?"

অপ্রতিভ হইয়াও ব্রজসুন্দরী দমিলেন না; তিনি সমান বিরক্তি-সূচক কণ্ঠে বলিলেন, "তা একবারেই কি বলতে পারবে ? ভাল ক'রে পড়ালে তবে তো পড়া বলতে পারবে। তা তো নয়, যাতে পড়তে না আসে সেই চেষ্টা।"

দুর্গাদেবী রাগতভাবে ক্ষেত্রনাথকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "যে পড়তে এসেছিল, তাকে এত মারধর ক'রেছিস্ কেন ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "বাঃ রে, পড়তে ব'সে পড়বে না, আর তাকে মারব না ?"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "নাঃ। খবরদার, তুই মারতে পাবি না।"

মাথা নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "না পড়লেই আমি মারবো।"

ক্রুদ্ধস্বরে দুর্গাদেবী বলিলেন, "ওদের ভাত খাবি, আর ওদেরই ছেলে ঠেঙ্গাবি ?"

গম্ভীরস্বরে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "হুঁ; ওদের ভাতও খাব, আর ওদের ছেলেটার মাথাও খাব, এ দু'টো কাজ আমার দ্বারা হবে না জেঠাইমা।"

এ উত্তরে দুর্গা দেবী নিরস্ত হইলেন।

ছেলেটাকে মারধর করার কথা যতীন বাবুর কাণেও উঠিল। যতীন বাবু শুনিয়া বলিলেন, "দূর হোক্, ধীরেকে যদি পড়াতেই হয়, তবে না হয় একটা মাষ্টার রেখে দিচ্ছি।"

ব্রজসুন্দরী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ওমা, ঐটুকু ছেলের তরে আবার মাষ্টার! বসিয়ে বসিয়ে একটা লোককে খাওয়াবে, আবার মাস মাস মাষ্টারের মাইনে গুণবে। একটা মানুষ তো, ক'দিক সামলাবে ? ও না

পড়ায়, নিজে সকালে সন্ধ্যায় পড়াটা ব'লে দেবে। ঐ রত্তি ছেলের কতই বা পড়া!"

তাহাই হইল। দিন কয়েক যতীন বাবু নিজেই ছেলেকে পড়াইলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত না হইতেই ব্রজসুন্দরী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছেলেকে তাড়া দিয়া বলিতেন, "আচ্ছা ধীরে, তৎক্ষণ বইখানা নিয়ে তোর খেতু দাদার ঘরে গিয়ে বসলেও তো পারিস্। সেই একটা লোক খেতে পুড়ে এসে পড়াবে তবে হবে। তার কি একটু নিশ্বাস ফেলবারও জো নাই?"

ছোট বোয়ের এই আকস্মিক পতিভক্তির মূল কারণ বুঝিয়া দুর্গা দেবী মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মাসকাবারে যতীন বাবু যখন হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়াছিলেন, তখন দুর্গা দেবী গিয়া তাহার সম্মুখে একখানি দশ টাকার নোট রাখিয়া দিলেন। যতীন বাবু মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলে দুর্গা দেবী বলিলেন, "খেতুর খোরাকী।"

যতীন বাবু কিছু না বলিয়াই পুনরায় হিসাবে মনঃসংযোগ করিলেন। দুর্গা দেবী ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষেত্রনাথ কিন্তু খোরাকীর কথা কিছু জানিল না; সে আপনার পড়া শোনা লইয়াই ব্যস্ত রহিল।

সেদিন সকালে ক্ষেত্রনাথ একটা দশমিকের ভগ্নাংশ পূরণ কষিতে না পারিয়া ভারী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আঁকটা দুইবার তিনবার চারিবার কষিল, কিন্তু কিছুতেই উত্তরের সঙ্গে মিলাইতে পারিল না। বিরক্তভাবে ক্ষেত্রনাথ খাতা পেন্সিল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শুনিল, পাশের বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। তাড়া-

তাড়ি খাতা বই গুছাইয়া রাখিয়া ক্ষেত্রনাথ গামছা লইয়া স্নান করিতে বাহির হইল। এমন সময় ব্রজসুন্দরী ডাকিয়া বলিলেন, "ও খেতু একবার গয়লানীর বাড়ী যেতে পারিস্? বেলা দশটা বেজে গেল এখনো দুধ দিয়ে গেল না, ছেলেটা কেঁদে সারা হচ্চে।"

একে আঁক মেলে নাই, তাহার উপর বেলা হইয়া গিয়াছিল. সুতরাং ক্ষেত্রনাথ রাগের সহিত উত্তর করিল, "আমি পারব না, আমার বেলা হ'য়ে গেছে।"

ব্রজসুন্দরী চড়া সুরে বলিলেন, "পারবে না যে তা জানি। তুমি আবার পার কি? বেলা হ'ল কেন? এতক্ষণ আমার সংসারের কি কাজ কচ্ছিলে?"

ক্ষেত্রনাথ মাসীমার মুখের উপর একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই কলতলার দিকে অগ্রসর হইল। ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "একটা কাজ বললেই পারব না, কিন্তু খাবার সময় তো কেউ পারব না বলে না? ভাতের কাঁড়িটা আসে কোথা হ'তে?"

দুর্গাদেবী রন্ধনশালায় ছিলেন; তিনি সত্বরপদে বাহিরে আসিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কেন বল্ দেখি ছোট বৌ, তোর এত কথা? ও কি তোদের চাকর, না অমনি তোদের খাচ্চে। খোরাকী দিয়ে খাচ্চে যখন, তখন তোর এত মুখ ঝামটা সইবে কেন বল্ দেখি?"

ব্রজসুন্দরী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "ইস্, ভারী তো খোরাকী! দশটা টাকা আবার টাকা, তাই খোরাকী। দশ টাকায় একজনের দু'বেলা চব্য চোষ্য হয় কি না!"

দুর্গাদেবী ইহার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই থামিয়া গেলেন। দেখিলেন, খেতুর মুখখানা যেন

সাদা হইয়া গিয়াছে, সে বিস্ময়ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। রাগের মাথায় খেতুর সম্মুখে খোরাকীর কথাটা প্রকাশ করিয়া যে কতদূর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাই ভাবিয়া দুর্গাদেবী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। ব্রজসুন্দরী আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে হতভাগা চাকরের উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ ধীরে ধীরে গলা কলের মুখে মাথা পাতিয়া বসিল।

আহারে বসিয়া দুই গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া ক্ষেত্রনাথ ডাকিল, "জেঠাই মা!"

দুর্গাদেবী তাহার দিকে না ফিরিয়াই উত্তর দিলেন, "কেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কে খোরাকী দিচ্চে, জেঠাই মা?"

দুর্গাদেবী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "যেই দিক্ না, তোর এত খোঁজে দরকার কি? তুই আপনার খেয়ে নে।"

ক্ষেত্রনাথ কোলের কাছের ভাতগুলা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তুমি মাসে দশ টাকা ক'রে দিচ্চ?"

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "হাঁ দিচ্চি। এমন ছেলেও দেখি না বাবা, একটা কথা কাণে গেছে তো অমনি কে, কি বৃত্তান্ত সব খোঁজ রাখা চাই। খেয়ে নে, বেলা যে এগারটা বাজে। কলেজে যাবি কখন্?"

কার্য্যান্তরের অছিলায় দুর্গাদেবী রন্ধনশালা হইতে চলিয়া গেলেন। ক্ষেত্রনাথ ক্ষিপ্রহস্তে আহার শেষ করিয়া উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্নেহের দাবী

সারা দিন রাত ভাবিয়া পরদিন সকালে ক্ষেত্রনাথ দাদা মহাশয়কে চিঠী লিখিতে বসিল। দুই তিন খানা কাগজ নষ্ট করিয়া শেষে লিখিল,—

"দাদা মশায়,

আপনার চিঠী পেয়েছি, কিন্তু লজ্জায় উত্তর দিতে পারি নাই। ক্রমে আমি যে রকম অকৃতজ্ঞতার কাজ করেছি, তাতে আমি নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত। আমার এখন ভুল ভেঙ্গেছে, কিন্তু যা করেছি, তার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতেও লজ্জা হয়।

আমি এখন আর চাকরী করি না, আবার পড়ছি। এতদিনে আবার লেখাপড়া শেখবার খুব সখ হয়েছে, কিন্তু দেখছি সে সখ মেটাবার পক্ষে বাধা অনেক। আপনি যদি দয়া ক'রে মাসে দশটী ক'রে টাকা পাঠিয়ে দেন তবেই পড়া হয়, নয়তো কলেজ ছাড়তে হবে। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। আপনার বিবেচনায় যা হয় করবেন। ইতি

আপনার স্নেহের ক্ষেত্র।"

চিঠী লেখা শেষ করিয়া ক্ষেত্রনাথ তাহা দুইবার তিনবার পড়িল, তারপর ভ্রূকুটী করিয়া চিঠীখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং ছিন্ন খণ্ডগুলাকে জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘড়িতে দশটা, সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ উঠিয়া ধীরে ধীরে স্নান করিতে চলিল। স্নান করিয়া যখন খাইতে গেল, তখন

এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। দুর্গাদেবী ভাত বাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত বেলা করলি যে? কলেজে যাবি কখন্?"

গণ্ডূষ করিয়া ভাত মুখে তুলিতে তুলিতে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আজ আর যাব না।"

"কেন?"

"ভাল লাগে না।"

ঈষৎ হাসিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "এরি মধ্যে অরুচি হ'য়ে গেল?"

ক্ষেত্রনাথ কোন উত্তর দিল না। দুর্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে কি করবি?"

উদাস স্বরে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "দেখি, যদি একটা চাকরী বাকরীর যোগাড় কত্তে পারি।"

"হুঁ" বলিয়া দুর্গাদেবী স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ নীরবে আহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

একটু পরে দুর্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি পড়া ছাড়বি?"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ উত্তর দিল, "তোমার কাছে কি মিথ্যা বলি জেঠাই মা।"

"কিন্তু কেন ছাড়বি ঠিক ক'রে বল্ দেখি?"

"বলেছি তো, ভাল লাগছে না।"

মৃদু তিরস্কারের স্বরে দুর্গাদেবী বলিলেন, "তাই না আমার কাছে মিথ্যা বলিস্ না?"

ক্ষেত্রনাথ লজ্জায় ঘাড় নীচু করিল। দুর্গাদেবী বলিলেন, "ও সব বদ্‌খেয়াল ছেড়ে খেয়ে দেয়ে কলেজে যা।"

ক্ষেত্রনাথ নিরুত্তর। দুর্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবি কি না বল্।"

মুখ না তুলিয়াই ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "না।"

বিরক্তির সহিত দুর্গাদেবী বলিলেন, "যাবি না? কেন বল দেখি?"

গম্ভীর স্বরে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "গিয়ে কি হবে?"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে দুর্গাদেবী বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ হবে।"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তোমার না হোক, তোমার টাকাগুলোর শ্রাদ্ধ হবে বটে।"

তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "ওঃ, তাই পড়া ছাড়বি? আমার পয়সায় খাওয়া, এতটা অপমান তুই স্বীকার করবি?"

একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "অপমান নয় জেঠাই মা, মিছে কেন তুমি পয়সাগুলো জলে ফেলবে।"

দুর্গাদেবী রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "আমার পয়সা আমি জলে ফেলি, উড়িয়ে পুড়িয়ে দিই, তোর তাতে কি?"

ক্ষেত্রনাথ মৃদু হাসিল; বলিল, "আমার তাতে একটু আপত্তি আছে বৈ কি জেঠাই মা, আমি যে তোমাকে ঠিক মায়ের মতই দেখি।"

দুর্গাদেবীর মুখখানা মুহূর্ত্তে আনন্দের কোমল জ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "আর আমি তোকে পরের ছেলের মত দেখি, এইটাই তুই ভেবে নিয়েছিস্, না?"

দুর্গাদেবী ক্ষেত্রনাথের মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ নতমুখে একটু ধরা গলায় বলিল, "না জেঠাই মা, আমি ঠিক তা মনে করি না।"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "যদি না মনে করিস্, তবে খেয়ে উঠে আস্তে আস্তে কলেজে চলে যা।"

ক্ষেত্রনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজ থাক্, বড্ড বেলা হ'য়ে গিয়েছে।"

দৃঢ়স্বরে দুর্গাদেবী বলিলেন, "না, আজ তোকে যেতেই হবে। এক এক দিন তো তুই এর চাইতে বেলাতেও যাস্।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কিন্তু এতে তোমার লাভটা কি জেঠাই মা?"

রুক্ষস্বরে দুর্গাদেবী বলিলেন, "লাভ? এক রত্তি ছেলে তুই, আমার লাভ লোকসানের কথা তুই কি বুঝবি?"

একটু হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কিন্তু যতটুকু বুঝি, তাতে ঘরাঘরি ঝগড়া ছাড়া আর কোন লাভ দেখতে পাই না।"

ক্ষেত্রনাথের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দুর্গাদেবী চড়া গলায় বলিলেন, "ঝগড়া? হ'লেই বা ঝগড়া? আজ যদি আমার একটা পেটের ছেলে থাকতো, তাকে মানুষ কত্তে হতো না, তাকে লেখা পড়া শেখাতে হ'তো না? তার জন্যে কারো সঙ্গে ঝগড়া কত্তে হ'তো না?"

দুর্গাদেবীর চক্ষু দুইটা সজল হইল, গলাটা ধরিয়া আসিল। সেই জলভরা চোখে ধরা গলায় দুর্গাদেবী বলিতে লাগিলেন, "যতীনকে মানুষ করেছি বটে, কিন্তু তাতে আমার ছেলে মানুষ করবার সাধ মেটেনি খেতা, এ কথাটা তুই মনে রাখিস্।"

ক্ষেত্রনাথের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া ভাতের থালায় পড়িল। দুর্গাদেবী বাঁ হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ব'সে থাকিস্ না, খেয়ে নে। বেলা বোধ হয় সাড়ে এগারটা।"

ক্ষেত্রনাথ তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া উঠিল, এবং জামা কাপড় পরিয়া কলেজে চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রণয়ী

মনোরমা টেবিল হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তোমাবে কেন পাই না।
ধরি ধরি কার ধরিতে না পারি কেন চলে যাও বল না।"

যামিনীনাথ অদূরে একটা চেয়ারে বসিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, আর ডান পাটা মেঝের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে তাল দিতেছিল। মনোরমার দৃষ্টিটা হার্ম্মোনিয়মের পর্দ্দার উপর সঞ্চালিত অঙ্গুলিগুলার উপরেই নিবদ্ধ ছিল, সুতরাং যামিনীনাথের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সে আপন মনে গাহিয়া যাইতেছিল,—

"ডাকি প্রেমময় আকুল পিয়াসে
তৃষিত হৃদয়ে বস নাথ এসে,
এস এস নাথ, এস হে দয়িত,—
প্রাণের পিয়াসা যাবে না।"

সহসা সম্মুখের দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মনোরমা হঠাৎ থামিয়া গিয়া মুখ নীচু করিল। সহসা অস্থানে গান বন্ধ করিতে দেখিয়া যামিনীনাথ দরজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইলেন, ক্ষেত্রনাথ একেবারে দরজার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যামিনীনাথ তাহার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই ?"

ক্ষেত্রনাথ অপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনোরমা বিদ্যুৎগতিতে মুখ তুলিয়া একবার যামিনীনাথের দিকে ভ্রূকুটীপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তারপর ক্ষেত্রনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া সহাস্যে বলিল, "আসুন।"

মনোরমা বাঁ হাত দিয়া পাশের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিল। ক্ষেত্রনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। যামিনীনাথ বজ্রাহতের ন্যায় নির্বাক্ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। একটা নগণ্য যুবকের সম্মুখে মনোরমা যে তাঁহাকে এতটা হীন প্রতিপন্ন করিতে পারিবে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। এক্ষণে সেই অচিন্তিত ব্যাপারটাকে প্রত্যক্ষ ঘটিতে দেখিয়া তিনি শুধু মর্ম্মাহত হইলেন না, এই সহসা আগত অসভ্য যুবকের প্রতিও হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশের আপাততঃ কোন অবসর না দেখিয়া তিনি শুধু রুদ্ধরোষে ফুলিতে লাগিলেন।

মনোরমা কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিল না। সে ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক'দিন আসেন নি কেন?"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "আপনারা কি আর আসবার পথ রেখেছেন? আঠার বছরের বুড়োকে একেবারে চোদ্দ বছরের ছেলের দলে ভিড়িয়ে দিয়েছেন। আমাকে তো এখন এক দৌড়ে এতটা পথ অতিক্রম করতে হবে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। যামিনীনাথ তীব্র ভ্রূকুটী করিলেন। মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি তাই ব'লে এক নিশ্বাসে ভারত শেষ কত্তে চান নাকি?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আমার তো ইচ্ছা তাই, কিন্তু ভারত যে তা শুনে না। সে আপনার লক্ষ শ্লোকের বিরাট দেহ নিয়ে হিমালয়ের মত

গম্ভীরভাবেই বসে আছে। আর আমার এই অস্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখে এক আধটু যে পরিহাসও না করছে এমন নয়।”

মনোরমা মৃদু হাসিতে হাসিতে আঙ্গুল দিয়া এক একটা পর্দ্দা টিপিতে লাগিল। যামিনীনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “গানে কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথকে রাজা বলি।”

মনোরমা গভীর ঔদাস্যের সহিত “তা হবে” বলিয়া ক্ষেত্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার পড়া বেশ চলছে তো?”

লজ্জায় অপমানে যামিনীনাথের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তিনি দেয়ালের পাশ হইতে ছড়িখানা টানিয়া লইয়া অসহিষ্ণুভাবে মেঝের উপর ঠুকিতে লাগিলেন। মনোরমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ক্ষেত্রনাথ বলিল, “আপাততঃ তো বেশ চলছে। আর জেঠাই মা থাকতে বোধ হয় না চলবারও কোন কারণ উপস্থিত হবে না।”

মনোরমা বলিল, “তিনি বুঝি আপনাকে খুব ভালবাসেন?”

ক্ষেত্রনাথ বলিল, “খুব-এর উপরেও যদি কিছু থাকে তবে তাই।”

ক্ষেত্রনাথের মুখখানা আনন্দের জ্যোতিঃতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মনোরমা তাহার হর্ষপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ অভিমানের স্বরে বলিল, “তাই বুঝি আর এদিকে আসা প্রয়োজন বোধ করেন নি?”

যেন চমকিত হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিল, “প্রয়োজন বোধ করি না? আপনাদের ভালবাসা, আপনাদের অযাচিত উপকার, এর চেয়ে প্রয়োজনীয় আমার জীবনে আর কিছু আছে নাকি?”

ঘাড় নীচু করিয়া মনোরমা বলিল, “আমরা আপনার এমন কিই বা ক’রেছি?”

“কি করেছেন? আপনারা? বাঃ রে!”

ক্ষেত্রনাথ পুনরায় উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যধ্বনিতে ঘরখানা যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে হাসির প্রতিধ্বনিটা যামিনীনাথের কাণে ঠিক বাজের মত ঠেকিল, বুকের ভিতর বঁড়শীর মত বিঁধিতে লাগিল। তিনি দাঁতে দাত চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং টুপিটা হাতে লইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যামিনীনাথকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথের যেন চমক হইল। সে তাড়াতাড়ি হাসির বেগ রুদ্ধ করিয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি চলে গেলেন যে?"

মনোরমা সহাস্যে বলিল, "এমন অনেক জীব আছে, যারা দিনের আলো সইতে পারে না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল,"না না, আপনাদের গান হচ্ছিল,আমি আসায় তাতে বাধা পড়েছে। উনি বোধ হয় আমার উপর বিরক্ত হ'যেই চলে গেলেন। আমি কিন্তু না জেনে—না না, আমাকে আপনারা মাপ কর্ব্বেন।"

ক্ষেত্রনাথ উঠিয়া দাড়াইল. এবং মনোরমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

মনোরমা খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর গানের খাতাখানা টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু কোন গানই পছন্দ হইল না। তখন সে খাতাখানা সরাইয়া রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে সা রে গা মা বাজাইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে বসিলেন। মনোরমা নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। দেবেন্দ্র বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেই গানটা শোনাত মা, সেই 'যাদের লাগিয়া তোমারে ভুলেছি'।"

মনোরমা হার্ম্মোনিয়মে স্থর দিয়া স্থরের সঙ্গে গলা মিশাইয়া গাহিতে লাগিল,—

"যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি তারা তো চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে ফেলে যায় মরু মাঝারে।"

দেবেন্দ্র বাবু চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনোরমা গাহিতে লাগিল,—

"দু দিনের হাসি দু দিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে।"

গান শেষ করিয়া মনোরমা চাহিয়া দেখিল, দেবেন্দ্র বাবু তখনও নিমীলিত নেত্রে নীরব নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখের কোণ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। মনোরমা পিতার ধ্যানগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সহসা করুণাময়ীর সশব্দ পদক্ষেপ সহকারে গৃহপ্রবেশে দেবেন্দ্র বাবুর ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চমকিত হইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। করুণাময়ী তাঁহার মুখের উপর ক্রোধরক্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, বারবার বলছি, তোমার আদরের মেয়েটীকে একটু ভদ্রতা শিক্ষা দাও, কিন্তু সে কথা তুমি কাণেও তুলছ না। এখন মেয়ের জন্য সমাজে মুখ দেখান ভার হ'য়ে উঠেছে তা বুঝেছ কি ?"

দেবেন্দ্র বাবু কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতেন না, সুতরাং তিনি নীরবে গৃহিণীর রোষপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিলেন। করুণাময়ী স্বরটাকে আরও চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি না বোঝ, না বুঝবে, আমি কিন্তু এতটা অভদ্রতার প্রশ্রয় কিছুতেই দিতে পারি না। এ রকম

বাড়াবাড়ি হ'লে শেষে আমাকে বাধ্য হ'য়ে এ সকল অভদ্র সংস্রব ত্যাগ করতে হবে এটা বুঝতে পারছ কি ?"

মৃদু হাসিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "বুঝিয়ে বললেই বেশ বুঝতে পারি। শুধু রাগে চীৎকার করলে কিছুই বুঝতে পারি না।"

স্বামীর মুখে হাসি দেখিয়া গৃহিণী আরও জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "রাগ ? একজন ভদ্র লোককে অপমান ক'রে বাড়ী হ'তে তাড়াবে, আর আমি মুখ বুজে তাই সহ্য করবো ?"

দেবেন্দ্র বাবু গৃহিণীর মুখের উপর বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন, "আজ তোমার আদরের মেয়েটী সেই হতভাগা মাষ্টারটার জন্য যামিনীকে কিরূপভাবে অপমানিত ক'রে তাড়িয়েছে তা ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাই না। তবে এ রকম অভদ্রতা প্রকাশ করলে আমার যে এ বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হ'য়ে উঠবে, শুধু এই কথাটাই জানিয়ে গেলাম।"

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই করুণাময়ী ঝড়বেগে বাহির হইয়া গেলেন। দেবেন্দ্র বাবু কন্যার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, মনোরমার মাথাটা নীচু হইয়া প্রায় হার্ম্মোনিয়মের পর্দ্দায় গিয়া ঠেকিয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে কন্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং আপনার হাতখানা তাহার মাথার উপর রাখিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সম্পূর্ণ অসম্ভব মনো, আমি এ কথায় বিশ্বাস করতে পারি না।"

মনোরমা মাথা না তুলিয়াই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না বাবা—"

বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বাবু স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু বলতে হবে না, মা, আমি তোকে মিথ্যা দোষ স্বীকার করতে বলছি না। যদি সত্যই

তাই হ'য়ে থাকে, তা হ'লেও যামিনী যেটাকে অপমান ব'লে ভেবে নিয়েছে, সেটা যে তোর ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, এ বিশ্বাস আমার কিছুতেই যাবে না।"

মনোরমার চোখ দিয়া ঝর ঝর জল গড়াইয়া পড়িল। দেবেন্দ্র বাবু প্রসন্নমুখে দাঁড়াইয়া তাহার ঘন কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উৎকণ্ঠা

"ও বৌমা, বৌমা, খবর শুনেছ ?"

রমা ঠাকুরঘরে পূজার উদ্যোগ করিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর বাবা ?"

ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "ক্ষেত্রনাথ বাবু যে আসচেন!"

উৎসুক স্বরে রমা বলিল, "আসচে ?"

মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, আসচে। গরমের ছুটী হ'য়েছে কি না।"

রমা পূজার আয়োজন ফেলিয়া ব্যস্তভাবে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে বাবা ?"

মাথা নাড়িয়া বিরক্তির সহিত ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কবে আসবে তা কেমন ক'রে জানবো বল। বাবুর মর্জ্জি, দয়া।"

রমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় ডান হাতের চিঠীখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "লিখেছে দু'এক দিনের মধ্যে যাচ্চি। তা চিঠীখানা তো আজ দুদিন হ'লো লিখেছে। তা হ'লে আজও আসতে পারে, কালও আসতে পারে। নাও আসতে পারে।"

রমা মৃদুস্বরে বলিল, "না বাবা, সে আসবে।"

মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তবে

তো আমি চতুর্ভুজ হয়ে যাব! আসে আসবে, না আসে না আসবে। আমি তো তার আসার জন্যে পথের দিকে চেয়ে আছি।"

ঘোষাল মহাশয়ের গলাটা যেন একটু ভারী হইয়া আসিল। তিনি কাশিয়া গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি আর ও সব ভাবনা ভাবি না বৌমা। কি হবে ভেবে? কে কার? এসেছি একা, যেতেও হবে একা। এখন যাতে সেই যাবার রাস্তাটা পরিষ্কার হয়, তাই দিনরাত ভাবচি। দামোদর! ঘোর পাতকী আমি, পায়ে একটু স্থান দিও দয়াময়!"

প্রাণের গভীর আবেগে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তিনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। রমা পুনরায় ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া পূজার উদ্যোগে মন দিল।

খানিক পরে ঘোষাল মহাশয় পুনরায় বাড়ী ঢুকিয়া বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হঁা বৌমা, তা হ'লে একবার বাজারে যাব নাকি?"

রমা বলিল, "এত বেলায় আবার বাজারে যাবে? নাওয়া, পূজো আহ্নিক এ সব হবে কখন্?"

মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হবেই এখন। না হয় একটু বেলা হবে। বাজারেও তো না গেলে নয়। ধর না, ছোঁড়া যদিই আসে, খাবে কি? আমাদের ঐ ছাই ভস্ম খাওয়া, ডাল চচ্চড়ি, সে কি ও সব খেতে পারবে?"

রমা বলিল, "তা একদিন যা হয় ক'রে খাবে এখন।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "একদিন কি, সে এক গ্রাসও খেতে পারবে না। তাকে কি জান না বৌমা, ভাল মাছটী, ভাল তরকারীটী না হ'লে একটী গ্রাস ভাত মুখে উঠতো না। তার উপর এখন সে আবার

কলকাতার বাবু হ'য়ে আসচে। এখন আর তোমার সে খেতা নয়, ক্ষেত্রনাথ বাবু। বুঝলে ?"

ঘোষাল মহাশয় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রমাও নত মস্তকে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "দাও, গামছাখানা কোথায় ? তা হ'লে দু'পাঁচ পয়সার একটু ভাল মাছ, আলু আর পটোল নিয়ে আসি।"

রমা বলিল, "আলু ঘরে আছে। উচ্ছে যদি পাওয়া যায়—"

ঘোষাল। আচ্ছা। আর ভাল তরমুজ পাই তো একটা আনবো। ওবেলা দামোদরকে নিবেদন ক'রে সরবৎ ক'রে দিলে হবে। রস্‌কে হাড়ীকে ব'লে যাই, দু'টো ডাব পেড়ে দিয়ে যাবে। এই বোশেখের রোদে আসবে। ভাল কথা, কাঁচা আম আনবো কি ?"

উত্তরের প্রত্যাশায় ঘোষাল মহাশয় বধূর মুখের দিকে চাহিলেন। রমা ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, "না না, এত আড়ম্বরে কাজ নাই। এই রোদে তুমি এত বোঝা বইতে পারবে না, বাবা।"

ম্লান হাসি হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বইতে আর পারবো না বৌমা ? আজ প্রায় ষাট বচ্ছর যে বোঝা ব'য়ে আসছি। যতদিন না দামোদরের পায়ে কর্ম্মের বোঝা নামাতে পারি, ততদিন যে এ ভূতের বোঝা বইতেই হবে বৌমা।"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘোষাল মহাশয় গামছাখানা কাঁধে ফেলিলেন, চটী জুতা পায়ে দিলেন; তারপর গমনোদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দূর হোক, ঠিক বলেছ বৌমা, এত আড়ম্বরে কাজ নাই। ভারী তো নবাবপুত্তুর আসচেন, তার জন্যে এত ! কোথাকার কে তার ঠিক নাই। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।"

উদ্দেশে ক্ষেত্রনাথের জন্য সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিতে করিতে ঘোষাল মহাশয় বাজারে চলিয়া গেলে রমা ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

অনেকক্ষণ পরে ঘোষাল মহাশয় রাশীকৃত বাজার লইয়া উপস্থিত হইলে রমা ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "তুমি করেছ কি বাবা? এত কি হবে?"

গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সহাস্যে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তোমার বাবার মাথা হবে। ভাল জিনিষগুলা দেখতে পেলাম, ছেড়ে আসতে মন সরলো না। চিরকালটাই কি শাক ভাত খেয়ে কাটাব? না হয় একদিন ভালই খেলাম। ছোঁড়া তালশাঁস কত ভালবাসে জান তো, গাছে উঠে তাল কেটে খেতো। তাই চার পয়সায় আটগণ্ডা তালশাঁস এনেছি। আর এই তরমুজটা—"

বাধা দিয়া রমা বলিল, "ধন্যি বাবা তুমি! আগে আসুক্।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আসুক কি, এসে ব'সে আছে। যদি দশটার গাড়ীতে আসে, তবে এতক্ষণ গাড়ী থেকে নেমেছে। তুমি রান্নাটা একটু হাত চালিয়ে নাও বৌমা, আমি ডুবটা দিয়ে এসে পূজো সেরে ফেলি।"

ঘোষাল মহাশয়ের অন্য দিন অপেক্ষা খুব শীঘ্রই সে দিন পূজা হইয়া গেল। পূজাতেও বেশ মন বসিল না। ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন; জপের সময় বাহিরে একটু শব্দ হইলেই কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন। কিন্তু সে শব্দের অসারতা যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন পুনরায় আচমন করিয়া জপে মন দিলেন। এমনি ভাবে পূজা শেষ করিয়া ঘোষাল মহাশয় যখন বাহিরে আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। রমা বলিল, "কৈ এলো না তো, বাবা?"

ঘোষাল মহাশয় সদর দরজার দিকে চাহিতে চাহিতে ঈষৎ হতাশা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "তাই তো! তবে এখনো আসবার সময় যায় নি; এই রোদে দেড় ক্রোশ পথ আসা তো সহজ নয়। গাড়ীও লেট হ'তে পারে।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ভাত বাড়বো?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন? একটা লোক রাস্তায় আসচে, আর আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে ব'সে থাকবো?"

ঘোষাল মহাশয় তামাক সাজিয়া লইয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

কতক্ষণ পরে রমা গিয়া ডাকিল, "তুমি খাবে এস বাবা, সে আসবে না।"

বধূর দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্র স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "সে এল, না এল, তাতে আমার কি? আমি তার জন্যই ব'সে আছি না কি? ইস্! আমার গুরু ঠাকুর আসবেন কি না!"

রমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, ভাত বাড়, বেলা কি আর আছে।"

রমা চলিয়া গেল। একটু পরে ঘোষাল মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিলেন। যাইতে যাইতেও কিন্তু দুইবার পাছু ফিরিয়া পথের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না।

আহারান্তে ঘোষাল মহাশয় বধূকে বলিলেন, "তুমি খাওয়া দাওয়া কর বৌমা, এ বেলা আর আসবে না। এই দুর্জ্জয় রোদে কি মানুষ আসে? আসে যদি পাঁচটার গাড়ীতে আসবে।"

বৈকালে রমা সবিস্ময়ে দেখিল, শ্বশুর দুই হাতে দুইটা বালতি লইয়া

ক্ষেত্রনাথের ফুলবাগানে জল ঢালিতেছেন। বাগানের আর সে শ্রী নাই; বেড়া অনেক দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; অধিকাংশ গাছই শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহাও নির্জ্জীব, শুষ্কপ্রায়। ঘোষাল মহাশয় আজ স্বহস্তে জল ঢালিয়া সেই নির্জ্জীব গাছগুলাকে, যেন সদ্য সদ্য সজীব করিয়া তুলিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিযাছেন। শ্বশুরের এই অস্বাভাবিক চেষ্টা দেখিয়া রমা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হচ্চে বাবা?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্চে, তাই জল দিচ্চি। ছোঁড়ার ফুল গাছের কি ঝোঁকই ছিল। এসে গাছগুলো দেখে হয় তো কেঁদেই ফেলবে। দিই একটু একটু জল, আমারও তো রাত পোয়ালেই ফুলের দরকার হয়।"

বালতির জলটা গোলাব গাছের গোড়ায় ঢালিতে ঢালিতে ঘোষাল মহাশয় একটু জোর গলায় বলিলেন, "তাকে এটাও বোঝাতে চাই বৌমা, বুড়োটা তার মত নেহাৎ নিষ্ঠুর নয়।"

রমা বলিল, "এ কথা সে বেশ বোঝে, বাবা।"

হাসিতে হাসিতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ছাই বোঝে। বুঝলেও ছেলেমানুষী বুদ্ধি কি না।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "এ বেলা ঠিক আসবে, কি বল?"

রমা বলিল, "হাঁ, যদি আসে—"

বাধা দিয়া ঈষৎ রাগতভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "যদি আবার কি? তোমাদের মেয়ে মানুষের ঐ এক কেমন স্বভাব, একটু খুঁত না রেখে কথা কও না।"

পাঁচটার গাড়ীতে আসিলে সাতটার সময় পৌঁছিবার কথা। যত সন্ধ্যা

হইতে লাগিল, ঘোষাল মহাশয় ততই যেন অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একবার বৈঠকখানায় বসেন, আবার উঠিয়া রাস্তার কতক দূর পর্যান্ত ঘুরিয়া আসেন। খানিকটা ঘুরিয়া বিরক্তচিত্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়া পড়েন, আর মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত দামোদরকে ডাকিয়া এই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকেন।

রাত্রি সাতটা, আটটা বাজিয়া গেল; ঘন অন্ধকারে পথ ঘাট গাছ-পালা সব ঢাকিয়া গেল। অন্ধকারাবৃত পল্লী ক্রমেই নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বৈঠকখানার অন্ধকার রোয়াকে ঘোষাল মহাশয় একা বসিয়া রহিলেন।

পাড়ার একটা ছোঁড়া সম্মুখের রাস্তা দিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"আসি আসি বোলে কেন প্রাণে বেথা দাও।
এমনো নিঠুর তুমি কাঁদিয়ে ফেলে চ'লে যাও॥"

ঘোষাল মহাশয় রুদ্ধশ্বাসে কাণ পাতিয়া রহিলেন। লোকটা গাহিতে গাহিতে গেল,—

"যতক্ষণ থাকো তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি,
পায়ে ধরি প্রাণনাথো দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও।"

উঃ, সকলেই কাঁদাইয়া চলিয়া যায়, আসি আসি করিয়াও আসে না; আবার সকলেহ তাহাকে পায়ে ধরিয়াও ফিরাইতে চায়। সংসারের এ রহস্য কি জটিল:—কি ঘৃণ্য! ঘোষাল মহাশয় অন্ধকারেই তীব্র ভ্রূকুটী করিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় নয়টা, তখন ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর গেলেন, এবং কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিলেন।

ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইলে রমা বলিল, "আজ আর এলো না, বাবা।"

এই একটা কথায় ঘোষাল মহাশয়ের নীরব ব্যাকুলতাটা যেন মুহূর্ত্তে তীব্র ক্রোধের আকারে উৎসারিত হইয়া পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আসবে? কে বললে আসবে? আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কি বল তো? খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছি এই পর্য্যন্ত। তার আসা না আসায় আমার ক্ষতি বৃদ্ধিটাই কি? সে এসে কি আমার স্বর্গে বাতি জ্বেলে দেবে?"

শ্বশুরের রাগ দেখিয়া রমা আর কিছু বলিতে পারিল না। ঘোষাল মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, উদ্গত দীর্ঘ নিশ্বাসটা জোরে বুকের ভিতর চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দামোদর, এই সব নিমকহারামদের নিমকহারামি হ'তে আমায় উদ্ধার কর ঠাকুর।"

ঘোষাল মহাশয় দ্রুতপদে আপনার ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারেই শুইয়া পড়িলেন। রমা তাহাকে খাইতে ডাকিতেও সাহস করিল না।

ঘোষাল মহাশয় শুইলেন বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না। রাত্রি সাড়ে নয়টায় একখানা ট্রেণ ছিল। সে গাড়ীতে ক্ষেত্রনাথের আসিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও ঘোষাল মহাশয় কিন্তু উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, যদি কেহ আসিয়া দরজা ঠেলে।

অনেক রাত্রিতে যেন কোথায় একবার দরজা নাড়িবার শব্দ হইল। ঘোষাল মহাশয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং ত্রস্তে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "বৌমা! বৌমা!"

রমার চোখেও ঘুম ছিল না। সে নিজের ঘর হইতে উত্তর দিল, "কেন বাবা!"

"কে দরজা ঠেললে না?"

"বেরালটা জানালা ঠেলে বেরিয়ে গেল।"

ঘোষাল মহাশয় হতাশভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তুমি বুঝি এখনো ঘুমাওনি? পড়ে পড়ে সেই হতভাগার তরে ভাবচো?"

ভাবনাটা যে রমার একার নয়, ইহা জানিলেও রমা কোন উত্তর দিল না। ঘোষাল মহাশয় ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "না, তোমরা সকলে মিলে আমাকে জ্বালিয়ে তুলেছ। তার তরে তোমার এত ভাবনা কেন বল তো? সে কে যে, তার তরে আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে হবে? আর জেগে থেকো না, ঘুমাও।"

বধূকে ঘুমাইতে উপদেশ দিয়া ঘোষাল মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন, কিন্তু নিজে ঘুমাইতে পারিলেন না। ঘুমাইবার জন্য জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না, চোখ করকর করিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি খেতুর উপর বিরক্ত হইলেন, বৌমার উপর বিরক্ত হইলেন। শেষে নিজের উপরেও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ছি ছি, এই বয়সে—এই জীবনের সন্ধ্যাবেলায় পরের ছেলের উপর এতটা মোহ! কে সে ক্ষেত্রনাথ? একটা অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল বালক মাত্র। সেই বালক তাঁহার মত প্রবীণ ব্যক্তিকে একি নাচাইতেছে! সে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া, ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর তিনি তাহার জন্য উৎকণ্ঠায় অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইতেছেন! ছি ছি, লোকে শুনিলে কি বলিবে! খেতু শুনিলে কি উপহাসের অট্টহাসি হাসিবে!

ঘোষাল মহাশয় চিত্তকে দৃঢ় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "না, খেতুর কথা তিনি মনের এক কোণেও আর ঠাঁই দিবেন না। যে তাঁহাকে

এই বয়সে মোহের গর্ত্তে ফেলিয়া স্নেহের খোঁচা দিয়া নির্ম্মমভাবে খোঁচাইয়া মারিতেছে, তাহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না।"

কিন্তু সে আসিব লিখিয়া আসিল না কেন? তবে কি সে তাঁহার সহিত কৌতুক করিবার অভিপ্রায়েই আসিবার কথা লিখিয়াছে! সে কি এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিবে? কোন অসুখ, পথে কোন বিপদ্ হয় নাই তো? যদি তাই হয়?

বৃদ্ধ দুই হাতে বুক চাপিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন, "দামোদর! জীবনের শেষ আছে, কিন্তু এ কর্ম্মভোগের—এ যাতনার কি শেষ নাই?"

দরবিগলিত অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বুড়ামানুষের রাগ

সকালে ঘোষাল মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। তামাক যে ঠিক খাইতেছিলেন এমন কথা বলা যায় না। বাঁ হাতে হুঁকাটা ধরা ছিল, কিন্তু তাহাতে টান বড় পড়িতেছিল না; কয়লার আগুন ছাই হইয়া বাতাসে উড়িয়া যাইতেছিল। সম্মুখে বকুলের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু উচ্চ চীৎকার করিতেছিল, দূর গ্রামপ্রান্ত হইতে আর একটা ঘুঘু তাহার উত্তর দিতেছিল। মৃদু বাতাসে বকুলের পাতাগুলা কাঁপিতেছিল, মাঝে মাঝে দুই চারিটা ফুল টুপ টুপ করিয়া মাটাতে পড়িতেছিল। অদূরে গাভাটা দাঁড়াইয়া বৎসের গাত্রলেহন করিতেছিল, বাছুরটা মাতার ঘাড়ের উপর মুখ তুলিয়া দিয়া নিমীলিত নেত্রে মাতার স্নেহ-কোমল স্পর্শ অনুভব করিতেছিল। রাস্তার পাশে একটা কুকুর সামনের পা দুইখানার ভিতর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, আর মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া গাত্রে সঞ্চরণশীল মক্ষিকাকুলকে দংশনের উপক্রম করিতেছিল। মাছিগুলা উড়িয়া পলাইতেছিল, কুকুরটা আবার পাতার ভিতর মুখ গুঁজিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগের চেষ্টা করিতেছিল।

ঘোষাল মহাশয় এ সকল কিছুই দেখিতে বা শুনিতেছিলেন না; তিনি দূর পথপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে এক একবার হুঁকায় টান দিতেছিলেন, কিন্তু সে টানে ধূম বাহির হইল কি না তাহাতে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়াই পুনরায় শূন্য পথের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

এমনই সময়ে নিতাই পাল আসিয়া তাঁহাকে প্রাতঃপ্রণাম করিল, এবং তালপাতার চাটাইটা টানিয়া লইয়া রোয়াকের নীচে বসিল। ঘোষাল মহাশয় একবার তাহার দিকে চাহিয়াই হুঁকায় টান দিলেন। ধূম বাহির হইল না দেখিয়া নিতাই হাত বাড়াইয়া বলিল,"পেসাদটা দিন না, ধরিয়ে দিই।"

ঘোষাল মহাশয় কলিকাটা নিতায়ের হাতে দিয়া হুঁকা রাখিয়া দিলেন। নিতাই হস্ত সংযোগে কলিকায় কয়েকটা জোর টান দিয়া যখন বুঝিল, কলিকায় আগুনের আর কোন সম্পর্কই নাই, তখন সে কলিকা রাখিয়া দিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাঠাকুরকে যেন ভাবিত দেখছি। খবর সব ভাল তো?"

উদাসভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মন্দই বা কি?"

নিতাই আর কিছু বলিল না। একটু পরে ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে ক'রে নিতাই?"

নিতাই হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "বড্ড বিপদ্ বাবাঠাকুর, ছেলেটার ব্যামো।"

"কি ব্যামো?"

"জ্বর, তার ওপর বুকে কফ বসেছে। হরিশ ডাক্তার বললে, ভাল রকম তদ্বির না হ'লে—"

বাধা দিয়া ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তাই আমাকে তদ্বির করতে ডাকতে এসেছ নাকি?"

ভীতিপূর্ণ স্বরে নিতাই বলিল, "আজ্ঞে আজ্ঞে—যদি গোটা দশেক টাকা দেন, তবেই ছেলেটা বাঁচে।"

বিকৃত কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তোমার ছেলে বাঁচুক মরুক আমার তাতে কি? আমি সে জন্য টাকা দিতে যাব কেন?"

নিতাই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিল, "আপনি আমাদের মা বাপ।"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তাই কথায় কথায় ঘরের টাকা বের ক'রে তোমাদের দিতে হবে। কেন, আমি তোমাদের কাছে এমন কিছু দাসখত লিখে দিয়েছি কি ?"

ভীতি-কম্পিত স্বরে নিতাই বলিল, "আজ্ঞে বাবাঠাকুর—"

গর্জ্জন করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এক পয়সা দেব না। কেন দেব ? কে আমার সব সাত পুরুষের কুটুম হে !"

নিতাই আজ ঘোষাল মহাশয়ের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল ; সে আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে কত টাকা পাওনা আছে বল দেখি ?"

নিতাই বলিল, "সাড়ে তের গণ্ডা।"

ঘোসা। আর তার সুদ ? আজ এক বচ্ছরের ভিতর একটী পয়সা সুদ দিয়েছ কি ?

নিতা। কোত্থেকে দেব বাবাঠাকুর, জানেন তো, এ বছর এক মুঠো ধান ঘরে তুলতে পারি নি।

রাগে চীৎকার করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তুমি ঘরে ধান তুললে, না তুললে আমার তাতে কি ? আমি টাকা দিয়েছি টাকা নেব। টাকা তুমি দেবে কি না বল।"

নিতাই হাত দুইটা জড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেব বই কি বাবাঠাকুর, আপনকার একটী পয়সা ফেলতে পারব না। কিন্তু দোহাই বাবাঠাকুর, আজ দশটী টাকা দেন, নয় তো আমার দাসু বাঁচে না।"

নিতাই কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিল। ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কে বাঁচে কে মরে আমার তা দেখবার দরকার নাই। এক মাসের মধ্যে আমার সুদ আসল সব টাকা চাই, নয় তো নালিশ ক'রে ঘর ভিটে গরু বাছুর বেচে টাকা আদায় করবো। আমার নাম রামতারণ ঘোষাল, আমি গুরুর দোহাই মানি না, টাকা আমার চাই। নিমকহারামের দল সব, কিন্তু আমিও আর কাউকে ছেড়ে কথা কইব না।"

চীৎকার করিতে করিতে ঘোষাল মহাশয় অস্থির পদে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন ; নিতাই বিষণ্ণচিত্তে প্রস্থান করিল।

ঘোষাল মহাশয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিলে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে চেঁচামেচি কচ্চো বাবা ?"

ঘোষাল মহাশয় সমানভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ঐ নিতে পাল। বলে ছেলের ব্যামো, টাকা দাও। কেন, আমি কি টাকার গাছ না আমি চোর-দায়ে বাঁধা পড়েছি ?"

রমা বলিল, "ব্যামো খুব কঠিন নাকি ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কঠিন না হ'লে কে আর টাকা ধার ক'রে ডাক্তার দেখায় বল।"

রমা। টাকা দেবে নাকি ?

ঘোষা। টাকা দেব ? কেন দেব ? আমার কি টাকা রাখতে জায়গা নাই। বলে ছেলেটা মরে। তার ছেলে মরে তাতে আমার কি ? আমি কি তাকে ধ'রে রাখব ? এই যে আমার ছেলে গেল, নাতি গেল, সুখের পসরা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। কে ধ'রে রাখলে বল তো ? এক পয়সাও দেব না। সব নেমকহারাম বৌমা, সব নেমকহারাম।"

"কে নেমকহারাম দাদামশায় ?"

ঘোষাল মহাশয় চমকিয়া পাছু ফিরিয়া চাহিলেন ; দেখিলেন, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ। ঘোষাল মহাশয়ের হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "খেতু !"

ক্ষেত্রনাথ অগ্রসর হইয়া দাদামহাশয়ের পায়ের ধুলা লইতে লইতে সহাস্যে বলিল, "না দাদামশায়, খেতা।"

ঘোষাল মহাশয় দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

আহারান্তে ঘোষাল মহাশয় চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া বহির্গমনে উদ্যত হইলে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "এই রোদে ভাত মুখে দিয়েই কোথায় চললে বাবা ? একটু শুলে না কেন ?"

একটু বিরক্তির সহিত ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হঁা শোব ; লোকে আমাকে শুতে দেবে কিনা। রাত না পোয়াতেই নিতে এসে খবর দিয়ে গেল, ছেলের ব্যামো। দেখি চিকিৎসার কি বন্দোবস্ত করলে। ছেলেটা বেঘোরে মারা যাবে ! আহা, পুত্রশোক যে বড় শোক বৌমা, ভগবান্ অতি বড় শত্রুকেও যেন এ শোক না দেন।"

ঘোষাল মহাশয়ের স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল ; রমা আঁচলে চোখ মুছিল। ঘোষাল মহাশয় চটী জুতাটা পায়ে দিতে দিতে বলিলেন, "কিন্তু আমিও আর পেরে উঠি না বৌমা। কার ছেলের ব্যামো, কে খেতে পায় না, কার দেনায় ভিটে বিকেয়ে যাচ্ছে, সে যখন বয়স ছিল দেখেছি, এখন এই বয়সে কি আর এত দেখা শোনা যায় ? কেন, গাঁয়ে কি আর লোক নাই ? আমার ইচ্ছা হয় বৌমা, একবার মরে দেখি, এই হতভাগা লোকগুলার কি গতি হয়।"

বকিতে বকিতে ঘোষাল মহাশয় বাড়ীর বাহির হইলেন। সকালে

যিনি নিতাই পালকে এক পয়সা দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আবার এই দুপুরের রোদে উপযাচকভাবে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিতে দেখিয়া রমা একটুও বিস্মিত হইল না। কেন না সে শ্বশুরকে বেশ ভাল রকমেই চিনিত। তিনি মুখে যাহাই বলুন, পরের বিপদে কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। তা ছাড়া সকালে তাঁহার রাগের যে কারণটা ছিল, ক্ষেত্রনাথ আসায় তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে। তাই তিনি সকালে রাগের মাথায় বিবেকের বিরুদ্ধে যে কাজটা করিয়াছিলেন, এই দুপুরের রোদে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ছুটিলেন। রমা স্থির জানিত, নিতাই পালের ছেলের চিকিৎসার রীতিমত বন্দোবস্ত না করিয়া শ্বশুর ফিরিবেন না, এবং ইহাতে দশ টাকার স্থলে যদি বিশ পঁচিশ টাকা খরচ হয় তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। শ্বশুরের কথা ভাবিতে ভাবিতে রমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল; মনে মনে বলিল, "হে ঠাকুর! এমন লোকের এ রকম সর্ব্বনাশ হ'লো কেন?"

নিতাই পালের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ঘোষাল মহাশয় প্রথমে রোগীকে দেখিলেন। তারপর নিতাইকে কতকগুলা গালাগালি দিয়া ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিল, তদ্বিরের ব্যবস্থা করিল। ঘোষাল মহাশয় ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম প্রভৃতি মিটাইয়া দিলেন, তারপর যাহাতে রোগীর রীতিমত তদ্বির হয় সে সম্বন্ধে বারবার উপদেশ দান করিয়া এবং নিতায়ের হাতে দশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন। যাইবার সময় নিতাইকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন, তাঁহার হাল বকেয়া সমস্ত টাকা শীঘ্রই পরিশোধ করিতে হইবে, নতুবা তিনি নালিশ করিয়া নিতায়ের

গরু বাছুর ঘটী বাটী পর্য্যন্ত বেচিয়া টাকা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বাড়ী ফিরিয়া ঘোষাল মহাশয় বধূকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেতা কোথায় গেল বৌমা ?"

রমা বলিল, "বেড়াতে বেরিয়েছে বোধ হয় ?"

ঘোষাল মহাশয় জুতা খুলিয়া চাদরটা আনলায় রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "এমন সময় আবার কোথায় গেল ? আচ্ছা বৌমা, এই ক' মাসেই ওর যেন অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে ব'লে বোধ হয় না ?"

রমা বলিল, "হাঁ, একটু হ'য়েছে বৈকি।"

জোর গলায় ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "একটু কি ? অনেক খানি বদলে গিয়েছে। আমার তো মনে হয় সে খেতাই নাই, কথা বার্ত্তা চাল চলন সব উল্টে গিয়েছে। তা যাবে না ? জায়গাটা কেমন ? এই জন্যই বলে—যদি না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থো। সমাজ জায়গার গুণই এক আলাদা।"

রমা কোন উত্তর করিল না। ঘোষাল মহাশয় হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "দেড় মাস ছুটী না ?"

রমা বলিল, "হাঁ, কিন্তু পনর দিন থেকেই চলে যাবে বলছিল।"

বিস্ময়ান্বিতভাবে ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলে যাবে ? কেন ?"

রমা বলিল, "বলছিল, না গেলে পড়ার ক্ষতি হবে।"

তাচ্ছীল্যের সহিত ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ইস্, ভারী তো পড়া ! প'ড়ে তো সবই করবেন। তবে আর কি বৌমা, তোমার ক্ষেত্রনাথ বাবু এবার জজ মাজিষ্টর হবে, আর তোমার ভাবনা কি ? তবে বুড়োর

ভাগ্যে আর তত দূর দেখা ঘটে উঠবে না, উঠেও কাজ নাই। আমি এখন এই আলোয় আলোয় যেতে পারলে বত্তে যাই।”

ঘোষাল মহাশয় গম্ভীরভাবে তামাক সাজিতে লাগিলেন, এবং কয়লা ধরাইয়া কলিকার উপর দিয়া দাবার উপর বসিলেন। তারপর বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হ্যা দেখ বৌমা, ও ছোঁড়া মনে করে বুড়ো বেটা ভারী বোকা। কিন্তু কে বোকা কে চালাক তা এবার ওকে বুঝিয়ে দেব।”

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ক'নে আশীর্ব্বাদী

বাস্তবিকই ক্ষেত্রনাথের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যে ক্ষুদ্র বামুনহাটী গ্রামখানাকে সে কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না, পাঁচ মাস পরে কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর সেই জঙ্গলাকীর্ণ খালখন্দে ভরা গ্রামখানা যখন তাহার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এক অননুভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দাঁড়াইল, তখন ক্ষেত্রনাথ তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। এই নগণ্য গ্রামের প্রত্যেক পথ ঘাট, প্রতি বৃক্ষলতার মধ্যে যে কতখানি মাধুর্য্য নিহিত রহিয়াছে, প্রত্যেক মানুষটীর সঙ্গে কি তীব্র মধুর আকর্ষণ আছে, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্ষেত্রনাথ শুধু বিস্মিত হইল না, এক অপূর্ব্ব পুলকও অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, জগতের যত সুখ, যত আনন্দ, সমস্তই যেন এই গ্রামখানির মধ্যে নিহিত। ইহাকে বাদ দিলে জীবনের সকল সুখই যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ক্ষেত্রনাথ যতই এই ভাবটাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিল, ততই পূর্ব্বকৃত অন্যায় আচরণের জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ সকল ঔদ্ধত্য, সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া যেন শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকে পরিণত হইল।

ক্ষেত্রনাথ সারাদিন গ্রামের এ বাড়ী সে বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইল; সকলের সাংসারিক সংবাদ লইল, নিজের সংবাদ তাহাদিগকে জানাইল। এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মাসীমা তখন সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ক্ষেত্রনাথ

গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। মাসীমা নিমিকে সন্ধ্যা দিবার আদেশ করিয়া খেতুর সহিত গল্প করিতে বসিলেন। নিমি সন্ধ্যা দেখাইয়া ঘরের ভিতর বসিয়া সুপারি কাটিতে লাগিল।

খেতু মাসীমার কাছে বসিয়া কলিকাতার অনেক গল্প বলিল। সেখানে মাসীর বাড়ীতে থাকিবার কথা, জেঠাইমার কথা, নিজের পড়া শোনার কথা, মনোরমার কথা, প্রভৃতি কোন কথাই বাদ রাখিল না। মনোরমার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে নিমি ভ্রূভঙ্গী করিল, এবং সুপারি কাটা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মা ডাকিলেন, "ঘরের ভিতর ব'সে কি কচ্চিস্ নিমি? একটা পান সেজে নিয়ে আয় না।"

নিমি পান সাজিয়া ডিপার খোলে তাহা রাখিয়া ক্ষেত্রনাথের সম্মুখে ধরিল। ক্ষেত্রনাথ তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছিস্ নিমি?"

অন্যদিকে মুখ রাখিয়া নিমি সংক্ষেপে উত্তর দিল "ভাল।"

ক্ষেত্রনাথ পান মুখে দিয়া বলিল, "তুই যে একেবারে শান্ত শিষ্ট হ'য়ে পড়েছিস্।"

নিমি কোন উত্তর দিল না। ক্ষেত্রনাথ পান চিবাইতে চিবাইতে সহসা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, কি পানই সেজেছিস্, যেমন ঝাল তেমনি তেঁতো। এত বড় ধেড়ে মেয়ে হ'য়েছিস্, এখনো পান সাজতে শিখলি না।"

নিমি নিরুত্তরে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া চূণ আনিয়া দিল। ক্ষেত্রনাথ একটু চূণ মুখে দিয়া বলিল, "কলকাতায় তোর মত বয়সের মেয়েদের দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। তারা কত ভাল ভাল কাজ করে।"

নিমির মুখে কোন কথা নাই। ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তুই বোবা হ'য়েছিস্ নাকি?"

নিমির মা বলিলেন, "সত্যিই তো নিমি, তোর মুখে আজ কথা নাই কেন? এ দিকে' তো খেতু দাদা কবে আসবে ভেবে ভেবে অস্থির হ'য়ে প'ড়েছিলি।"

মৃদু হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তাই নাকি?"

নিমির মা বলিলেন, "রোজ সেই কথা বাবা, কেন তুমি কলকাতায় গেলে, কবে আসবে, কেমন আছ, দু'বেলা আমাকে এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হ'তো।"

মাতার মুখের উপর সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "ওর বিয়ের কিছু করতে পারলে মাসীমা?"

মাসীমা বলিলেন, "কিছুই না বাবা, কোথায় আর কি করবো বল।"

ক্ষেত্রনাথ চিন্তিতভাবে বলিল, "তাই তো, অনেকটা বড় হ'য়েও উঠেছে।"

মাসীমা নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিল, "দেখতে শুনতে ভাল হ'লেও চেষ্টা চরিত্র দেখা যেতো। আমি মনে করেছিলাম কলকাতায় দেখবো। কিন্তু ও বাবা, সেখানে মেয়ে একটী আস্ত পরী চাই, আর সেই সঙ্গে তিন চার হাজার টাকা। দেশে ঘরেই দেখে শুনে দিতে হবে।"

মাসীমা নিরুত্তর। ক্ষেত্রনাথ বলিল, "যাই হোক মাসীমা, আর দেরী ক'রো না, চেষ্টাচরিত্র দেখ।"

মাসীমা হতাশব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, ওরও বিয়ের ফুল ফোটা চাই।"

অতঃপর ক্ষেত্রনাথ আর কিছুক্ষণ গল্প করিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে নিমি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া রুষ্ট স্বরে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সেই পয়সা ক'গণ্ডা দিয়ে গেল মা!"

মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "রক্ষা কর্ নিমি, তুই আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ না।"

নিমির মা এতদিন যে সূক্ষ্ম আশা-সূত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন, ক্ষেত্রনাথের কথায় সেই সূত্রটুকুও যখন ছিন্ন হইল, তখন তিনি আর কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার ভাবিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল।

ক্ষেত্রনাথ কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত রহিল না, সে অন্যান্য কথার সঙ্গে নিমির কথাও পিসীমাকে বলিল, এবং নিমির বিবাহের জন্য সে যে একটু চিন্তিত এমন ভাবটাও প্রকাশ করিল। রমাও শুনিয়া চিন্তিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

রমা এ কথ শ্বশুরকে জানাইল। ঘোষাল মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, "নিমির জন্য ও ছোঁড়ার এত মাথাব্যথা কেন?"

রমা বলিল, "নিমির মা ওকে খুব যত্ন আত্তি করে কি না। আর খেতুও মেয়েটাকে খুব ভালবাসে।"

ঘোষাল মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন, "বিয়ের বাজার আজকাল বড় সস্তা নয় বৌমা, তবে যদি তোমার শাশুড়ী ক'রে আনতে বল, তা হ'লে বরং সস্তা হ'তে পারে।"

রমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাতেই বা ক্ষতি কি?"

ঘোষাল মহাশয়ও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ক্ষতির মধ্যে তোমার ক্ষেত্রনাথ বুড়ার কাঁধে মাথাটা রাখবে না।"

সেইদিন অপরাহ্নে ঘোষাল মহাশয় খাতকদের কাছে তাগাদা সারিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে নিমিদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং বাড়ীতে ঢুকিতে ঢুকিতে ডাকিলেন, "নিমি, ওগো নিমাইমণি!"

নিমির মা তখন ঘরের দাবায় বসিয়া পৈতা তুলিতেছিলেন; নিমি তূলার পাঁজ প্রস্তুত করিয়া, সূতা গুটাইয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেছিল। ঘোষাল মহাশয়ের সাড়া পাইয়া নিমির মা তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিমি বলিল, "কে, দাদামশায়, আসুন।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ভাগ্যে আসতে বললি দিদি, নৈলে আমি চলেই গিয়েছিলাম।"

নিমি হাসিয়া বলিল, "বালাই, চলে যাবে কেন দাদা মশায়, জন্ম জন্ম আসবে।"

ঘোষাল মহাশয়ও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "রক্ষে কর্ দিদি, এক জন্মেই যথেষ্ট হ'য়েছে, এই রকম যদি জন্ম জন্ম আসতে হয়,—না নিমাইমণি, তাতে আমি রাজি নই।"

নিমি বলিল, "তুমি রাজি না হ'লেও আমরা ছাড়ব কেন দাদা মশায়?"

নিমির মা ততক্ষণে একখানা কম্বলাসন পাতিয়া দিয়াছিলেন। ঘোষাল মহাশয় তাহাতে উপবেশন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা দিদি, সেই দিনই আসুক, তখন দেখিয়ে দেব ছাড়তে হয় কি না। তোরা পাশে দাঁড়িয়ে হায় হায় ক'রে কাঁদবি, আর আমি হাসতে হাসতে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলে যাব।"

কথা শেষ করিয়া ঘোষাল মহাশয় একটু হাসিলেন, কিন্তু সে হাসিতে প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে অনেকখানি বিষাদের ছায়াই ফুটিয়া উঠিল। নিমি একটু সরিয়া আসিয়া পাশে খুঁটীটা ধরিয়া দাঁড়াইল; এবং জিজ্ঞাস করিল, "তারপর কি মনে করে, দাদা মশাই?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "খুব ভাল কথাই মনে করে। বিয়ে করতে এসেছি।"

নিমি বলিল, "একেবারে বিয়ে।"

সহাস্যে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, সাঙ্গা নয়, নিকে নয়, একে-বারে বিয়ে। তোরও তো বর জুটলো না, আমারও এ বয়সে আর অন্য ক'নে জুটবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই তোর সঙ্গে আমার মিলবে ভাল। এখন তোর মত আছে কি না বল্ দেখি।"

নিমি হাসিয়া বলিল, "খুব আছে।"

ঘোষাল মহাশয় তখন অদূরে দণ্ডায়মানা নিমির মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল গো বৌমা?"

নিমির মা ঘোমটার ভিতর মৃদু হাসিয়া সম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিলেন। ঘোষাল মহাশয় নিমির দিকে ফিরিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "ব্যস্, তবে আর কি, নে আয়, সামনে বোস্ দেখি।"

নিমি হাসিতে হাসিতে সম্মুখে বসিয়া পড়িল। ঘোষাল মহাশয় নিমির মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কৈ গো বৌমা, দাঁড়িয়ে রৈলে যে? গাছ কতক দুব্বো, গোটাকতক ধান দাও না। ধন্যি বাবু তোমাদের, এত বড় ধেড়ে মেয়ে পুষে রেখেছে, তবু যদি একটু ত্বরা আছে।"

নিমির মা কৌতুক দেখিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি ধান দূর্ব্বা আনিয়া দিল। ঘোষাল মহাশয় ধান দূর্ব্বা হাতে লইয়া নিমির দিকে

চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু ভেবে দেখ্ নিমি, বুড়োকে পছন্দ হবে তো?"

নিমি ঘাড় নাড়িয়া জোর গলায় বলিল, "খু-উ-ব।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "পছন্দ না হবেই বা কেন? মাত্র চুলগুলা সাদা হ'য়েছে, সামনের দাঁত ক'টা প'ড়েছে। তা ছাড়া পছন্দ না হবার আর কি আছে? আর শেষে পছন্দ যদি না হয়, তখন খেতা ছোঁড়া আছে, তার সঙ্গে বদল ক'রে ফেললেই হবে। তবে শুভস্য শীঘ্রং। দুর্গা, দুর্গা! 'বুধে বাণ তৃতীয়কং'। বারবেলা কালবেলা সব কেটে গেছে। জয় দামোদর!"

ঘোষাল মহাশয় ধান দূর্ব্বা নিমির মাথায় দিলেন, এবং ট্যাঁক হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া নিমির হস্তে প্রদান করিলেন। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নে ছুঁড়ি, গড় কর্, পায়ের ধুলো নে। কৈ গো বৌমা, শাঁখটা বাজাও না, এটাও কি ব'লে দিতে হবে।"

নিমি মস্তক নত করিয়া দাদা মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। ঘোষাল মহাশয় তাহার মাথার উপর হাত দুইটা রাখিয়া হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "হয়েছে দিদি হয়েছে, আশীর্ব্বাদ করি, লক্ষ্মী নারায়ণের মত হ'য়ে দু'জনে ঘর ঘরকন্না কর্। আর শেষের দিনে দু'জনে আমার সামনে দাঁড়াস্। আমি লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্ত্তি দেখে হাসতে হাসতে লক্ষ্মী নারায়ণের কাছে চলে যাব।"

বৃদ্ধের হর্ষোজ্জ্বল নেত্রবিগলিত আনন্দাশ্রু ধারায় নিমির মস্তক সিক্ত হইল। মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে নিদাঘের অপরাহ্ন মধুময় হইয়া উঠিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

মেয়ে পছন্দ

নিমিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘোষাল মহাশয় বাড়ী ফিরিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বৌমা, দীনু চক্রবর্ত্তীর মেয়ে নিমিকে দেখেছ ?"

রমা বলিল, "দেখেছি বৈকি, আমাদের বাড়ীতেই যে ক'দিন এসেছিল।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মেয়েটী কেমন বল দেখি ?"

রমা বলিল, "নেহাৎ মন্দ নয়।"

ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মন্দ নয় কি ! দিব্যি মেয়ে। গায়ের রংটা কটা নয় এই তো ? তা ছাড়া আর কি দোষ আছে বল দেখি ?"

সঙ্কুচিত স্বরে রমা বলিল, "না, দোষ তেমন কিছু নাই।"

রাগতভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন,"তেমন কি, কোন দোষই নাই। আর যদিই বা কিছু দোষ থাকে, তাই ব'লে কি তার বিয়ে হবে না ?"

মুখ নীচু করিয়া রমা বলিল, "তা আর হবে না ?"

মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তবেই বল দেখি, রূপে কি আসে যায় ? রূপটা কিছুই নয় বৌমা, গুণ—গুণ থাকা চাই। তোমার শাশুড়ীর রূপটা কেমন ছিল দেখেছ তো। কিন্তু এদিকে গুণ কেমন ছিল বল দেখি ?"

রমা বলিল, "তাঁর কথা ছেড়ে দাও বাবা, তিনি ছিলেন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

ঘাড় দোলাইয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "সাক্ষাৎ লক্ষ্মীই বটে বৌমা। এই যে আমার এত জমি জায়গা, পয়সা কড়ি, এ সকলি তার পয়ে। তা ছাড়া সেবা বল, যত্ন বল, ভক্তি বল, ভালবাসা বল, কোন্‌টা কম ছিল? দিন রাত খেটেচি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেচি, কিন্তু কষ্ট কাকে বলে, তা একটী দিনের তরেও আমাকে জানতে দেয় নি। বাইরে যতই তেতে পুড়ে আসি, বাড়ী ঢুকলেই সব ঠাণ্ডা; মনে হ'তো, যেন আগুনের খাপরা হ'তে হঠাৎ বরফের ঘরে এসে পড়লাম।"

অতীত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধের স্বরটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, চোখের পাতাগুলা ভিজিয়া আসিল। রমা আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তেমন মেয়ে হাজারে একটা পাওয়া যায় না বাবা।"

উচ্ছ্বাস-বহ্বল কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হাজারে কেন বৌমা, লাখের মধ্যেও একটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাক্ দামোদর, সকলি তোমার ইচ্ছা!"

বৃদ্ধের বেদনাতুর হৃদয় মথিত করিয়া একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। ঘোষাল মহাশয় একটু থামিয়া, বিহ্বল চিত্তটাকে কথঞ্চিৎ শান্ত সংযত করিয়া বলিলেন, "তবেই বল বৌমা, বাইরের রূপটা কিছুই নয়, শুধু দর্শন-ডালি। কিন্তু ভিতরে যদি গুণ থাকে, তবে সে যতই কালো হোক, কুৎসিত হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না।"

নিমিকে সুন্দর প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্বশুরের কেন যে এতটা আগ্রহ, তাহা রমা বুঝিতে পারিল না। সুতরাং সে শুধু শ্বশুরের কথায় সায় দিয়া চুপ করিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বৌমা, ধর এই নিমি যদি তোমার বৌ হয়, তা হ'লে মন্দ হয় কি?"

রমা বলিল, "না, মন্দ হবে কেন? আমাদের গেরস্ত ঘরে—"

সহাস্তে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এই দেখ দেখি, ঠিক বলেছ, আমাদের গরীব গেরস্ত ঘরে রূপসী মেয়ে এনে কি হবে? যাক্, তা হ'লে তোমার অমত নাই তো?"

বিস্ময়সূচক স্বরে রমা বলিল, "তুমি কি নিমির সঙ্গে খেতার বিয়ে দেবে মনে করেছ?"

জোর গলায় ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মনে করেছি কি, আমি একেবারে আশীর্ব্বাদী ক'রে এসেছি।"

রমা বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল। ঘোষাল মহাশয় ঘাড়টা উঁচু করিয়া গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মনে করা-করি নাই; রামতারণ ঘোষাল মনে যা করে, হাতে কলমে তাই ক'রে দেখায়।"

রমা চুপ করিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বৌমা, কাজটা মন্দ ক'রেছি কি?"

রমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মন্দ নয় বাবা, কিন্তু—"

অধীরভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মন্দই যদি নয়, তবে আবার কিন্তু কি? তোমাদের বাছা ঐ এক কেমন দোষ, একটু খুঁত না রেখে কথা কওনা।"

রমা বলিল, "অন্য কোন খুঁত নয় বাবা, তবে খেতার মতটা একবার জানলে হ'তো।"

ঘোষাল মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই কথা! দেখ বৌমা, তোমরা মনে কর বুড়ো হ'লে মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পায়। কিন্তু তা নয়, বুড়োদের মাথার

চুলগুলো যেমন পাকতে থাকে, তাদের বুদ্ধিটা তার চেয়েও বেশী পেকে উঠে। সেই পাকা বুদ্ধিতে লোকে হাঁ করলে তার পেটের কথাগুলা সব বুঝে লওয়া যায়।"

রমা অপ্রতিভভাবে মস্তক নত করিল। যদিও সেখানে তখন কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি ঘোষাল মহাশয় একবার ইতস্ততঃ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে এমনি পাগল ঠাউরেছ বৌমা, যে আমি ওর মনের ভাব না বুঝেই এ কাজে হাত দিয়েছি। ওর সম্পূর্ণ ইচ্ছা, নিমির সঙ্গে বিয়ে হয়। এ আমি শালগ্রাম ছুঁয়ে বলতে পারি। হয় নয়, তুমি গেল বারেও বিয়ের কথা তুলে দেখেছ তো, এবারেও তুলে মজা দেখো না।"

রমা মৃদু হাসিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "অনেক ভেবে চিন্তেই এ কাজ ক'রেছি। ওরও ঝোঁক আছে, মেয়েটীও ভাল, জানা শোনা ঘর। আর এই যে বাবু কথায় কথায় ফোঁস্ ক'রে উঠেন, আমাকে ঠেলে দিয়ে, তোমাকে ঠেলে ফেলে ছুটে চলে যান, সেটী আর হচ্চে না। এ বিয়ে নয় তো, রীতিমত পায়ের বেড়ী। এ বেড়ী কেটে সহজে আর পালাতে পাচ্চেন না। বুঝলে?"

রমা বলিল, "তা হ'লে বিয়েটা কি এরি মধ্যে হবে?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এরি মধ্যে হোক, আর দু'মাস পরেই হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না। আশীর্ব্বাদ যখন হ'য়েছে, তখন ধর বিয়ে হ'য়েই গিয়েছে।"

রমা বলিল, "কিন্তু বাবা ওরা ছেরত্তরি (শ্রোত্রিয়), আর খেতা যে কুলীনের ছেলে।"

ঘোষাল মহাশয় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, রোষদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "রেখে

দাও তোমার কুলীন। কুলীন এখন কোন্ শা—? কুলীন কাকে বলে জান, নবগুণ—আচারো বিনয়ো বিদ্যা, এই রকম নয়টী গুণ থাকা চাই। নয়টী গুণের একটী গুণও আছে? বিষ নাই কুলোপানা চক্র!"

শ্বশুরকে রাগিতে দেখিয়া রমা ধীরে ধীরে বলিল, "তা বাবা, তুমি যদি বল—"

বাধা দিয়া ঘোষাল মহাশয় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি কি বলবো? একি আমার নিজের ছেলে? আমি তাঁকে মিনতি ক'রে বলতে যাব, ওগো কুলীনপুত্র মহাশয়, দয়া ক'রে ছেরত্তরির কুল পবিত্র কর। ঝাঁটা মার কুলীনের মুখে! তুমি খোকাকে জিজ্ঞাসা করবে তার মত আছে কি না। যদি অমত হয়—হ'লেই বা অমত, দেশে আর ছেলে নাই বুঝি? কিন্তু এটাও বলে রাখি বৌমা, নিমির বিয়ের জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ। আমি যখন হাত দিয়েছি তখন সহজে ছাড়ছি না। আমার নাম রামতারণ ঘোষাল। বুঝলে?"

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া দ্রুত পদে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রমা সময়মত কথাটা ক্ষেত্রনাথকে শুনাইল। ক্ষেত্রনাথ শুনিয়া হাঁ না কিছুই বলিল না। রমা তাহার এই মৌন ভাবটাকেই সম্মতির লক্ষণ জানিয়া লইল, এবং শ্বশুরের নিকট সাহ্লাদে তাহাই প্রকাশ করিল। ঘোষাল মহাশয় শুনিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া বলিলেন, "এই দেখলে বৌমা, বুড়োর বুদ্ধিটা দেখ। হাঁ হাঁ, এইবার রাম যাবে কোথায়? দেখি ছোকরা এবার রাগ ক'রে কেমন এখানে সেখানে যান!"

রমা সহর্ষে বলিল, "কিন্তু বাবা, এই ছুটীর মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেল।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা দেখি। কিন্তু আড়ম্বর কিছু করবো না। ভবার বিয়েতে আলো আর বাজনায় দু'টী হাজার টাকা খরচ করেছিলাম।"

ঘোষাল মহাশয় কাশিয়া গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "আর জাঁকজমকে ইচ্ছা হয় না বৌমা। অমনি বর বামুন নিয়ে, নমো-নম ক'রে কোন রকমে সেরে ফেলা যাবে।"

রমাও বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিল, "সেই ভাল বাবা, তবে—"

ঈষৎ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তবে আবার কি? একটু জাঁকজমক চাই, এই তো? তোমাদের কি চিনি না বৌমা। কিন্তু আচ্ছা, মোটের উপর একটী হাজার—এর বেশী এক পয়সা খরচ করতে পারব না তা ব'লে রাখলাম। তাতে রাগ কর করবে। রাগটাই বা কিসের? আমি পাব কোথায়? আমার কি সাতটা বেটা পুত্তুর রোজগার কচ্চে, না আমারই খাটবার বয়স আছে?"

অতঃপর ঘোষাল মহাশয় পাঁজি বাহির করিয়া বিবাহের দিন দেখিতে বসিলেন।

ক্ষেত্রনাথ কিন্তু বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া বড়ই বিরক্তি বোধ করিল। সে পিসীমাকে বলিল, "তোমাদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আমি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে পারব না।"

রমা আশ্চয্যান্বিতভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষেত্রনাথ উত্তর দিল, "এখন আমার এগ্‌জামিনের পড়া। এগ্‌জামিন না দিয়ে আমি বিয়ে করব না।"

রমা ভয়ে ভয়ে কথাটা শ্বশুরকে জানাইল। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। সহজ শান্তভাবেই বলিলেন,

"আচ্ছা বৌমা, ওর যদি তাতেই সন্তোষ হয়, তবে তাই হবে। যাক্ ক'টা মাস বৈ তো নয়।"

রমা যেন একটু রাগ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কিন্তু বাবা, ঐ এক রত্তি ছেলের মতেই কি আমাদের চলতে হবে ?"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তা ছাড়া আর উপায় কি বৌমা, একি তোমার পেটের ছেলে !"

শ্বশুরের ধৈর্য্য দেখিয়া রমা আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

আসল কথা, নিমিকে বিবাহ করিতে ক্ষেত্রনাথের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না। একদিন তাহার এ ইচ্ছা ছিল বটে, এবং এই ইচ্ছার বশেই সে নিমির মাকে নিমির বিবাহবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু ক্ষেত্রনাথ তখন কলিকাতা দেখে নাই, মনোরমার মত বালিকাদের দেখে নাই। তখন সে পল্লীসুলভ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ ছিল; স্বভাবের উপর কৃত্রিমতার আবরণ দিলে সে সৌন্দর্য্য যে কতটা ফুটিয়া উঠে, কত তীব্রভাবে মন আকর্ষণ করে, ইহা বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এখন সে নিমির পাশে মনোরমাকে দাঁড় করাইয়া যখন তুলনায় সমালোচনা করিবার অবসর পাইল, তখন উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের পার্থক্য দর্শনে সে নিমির উপর কতকটা বিরূপ না হইয়া থাকিতে পারিল না। চাঁদের পাশে নক্ষত্রের মত, গোলাপের পাশে ক্ষুদ্র যূথিকার মত, মনোরমার পাশে নিমিকে খুবই ছোট দেখাইল।

তাই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ এমন আশা করে নাই যে, মনোরমার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। না হইলেও কিন্তু সে নিমির মত অশিক্ষিতা অমার্জ্জিত-চরিত্রা রূপসম্পদ্‌বিহীনা বালিকাকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া লইতে পারিল না। এদিকে স্পষ্ট জবাব দিয়াও সে দাদামহাশয়ের প্রাণে

ব্যথা দেওয়া নিতান্ত অসভ্যতা জ্ঞান করিল। ব্যথা শুধু দাদামহাশয় পাইবেন না, নিমির মা এবং নিমিও দাদামহাশয় অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যথা পাইবে। ক্ষেত্রনাথ এতটা রূঢ় হইতে পারিল না। সে আপাতত এগ্জামিনের দোহাই দিয়া এই রূঢ়তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল;

বিবাহের কথাটা আপাতত চাপা রহিল। ছুটী শেষে ক্ষেত্রনাথ পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আলোকে ছায়া

মনোরমা যে ক্রমেই ক্ষেত্রনাথের উপর অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে, এ সন্দেহটা শুধু যামিনীনাথের নয় করুণাময়ীরও মনে উঠিয়াছিল। সুতরাং তিনি এই অবৈধ ভালবাসার বিরুদ্ধে স্বামীর নিকট অনুযোগ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এখন হইতে সাবধান না হইলে এই ভালবাসার পরিণাম নিশ্চয়ই বিষময় হইবে। তাহাতে শুধু মনোরমাকে নয়, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত শেষে অনুতাপ করিতে হইবে।

দেবেন্দ্র বাবুও ইহা বুঝিলেন। বুঝিলেও কিন্তু কন্যার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি শুধু ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে যামিনীনাথও করুণাময়ীর নিকট উৎসাহ পাইয়া মনোরমার অনুরাগ আকর্ষণ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। করুণাময়ী আকারে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারই সহিত মনোরমার বিবাহ হওয়া নিশ্চিত, তিনিই তাহার ভালবাসা পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। তবে সে যদি কিছু দোষ করিয়া থাকে, তাহা বালিকা-বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে। করুণাময়ীর নিকট এইরূপ আশা পাইয়া যামিনীনাথ নবোদ্যমে মনোরমার হৃদয়দুর্গ জয়ের জন্য উদ্যোগী হইল।

শুধু করুণাময়ীর নিকট নহে, মনোরমার নিকটেও তিনি এমন কতকটা আশ্বাস পাইলেন, যাহাতে করুণাময়ীর কথাটাই সত্য বলিয়া শীঘ্রই প্রতীতি জন্মিল। এরূপ প্রতীতির কারণও ছিল। মনোরমা

অনিচ্ছাসত্ত্বে সহসা একদিন যামিনীনাথকে অপমানিত করিয়া শুধু লজ্জিত হয় নাই, আপনার এই কাজটাকে নিতান্ত ভদ্রতাবিগর্হিত কাজ বলিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এমন কাজ না হয়, তজ্জন্য যথেষ্ট সাবধানতাও অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর সে কথায় বার্ত্তায় আকারে ইঙ্গিতে এমন ভাব একটুও প্রকাশ করিল না, যাহাতে যামিনীনাথের উপর তাহার বিরক্তি বা অশিষ্টতা প্রকাশ পায়। যামিনীনাথ তাহার চেষ্টাকৃত এই সতর্কতাটুকুকেই অনুরাগের লক্ষণ বলিয়া বুঝিয়া লইল, এবং এই অনুরাগ যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে ক্ষেত্রনাথও ছুটীতে দেশে চলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং যামিনীনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে মনোরমার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া লওয়া খুব সহজ জ্ঞান করিল।

এখন শুধু যামিনীনাথই মনোরমার কাছে আসিতেন না, মনোরমাও মধ্যে মধ্যে মাতার সহিত ঘোষ সাহেবের বাড়ীতে যাইত। যামিনীনাথ গল্প করিতে বসিলে সে বেশ মনোযোগ সহকারেই তাঁহার গল্প শুনিতে থাকিত। কথার উত্তর প্রত্যুত্তর যাহা দিত, তাহার মধ্যে শুধু প্রসন্নতাই প্রকাশ পাইত। এক একদিন মোটরকারে চড়িয়া যামিনী-নাথের সহিত বেড়াইয়াও আসিত। যামিনীনাথ ফুলের তোড়া বা অন্য কোন উপহার দিলে মনোরমা মৃদুমধুর হাস্য ও আহ্লাদসূচক ধন্যবাদ সহকারেই তাহা গ্রহণ করিত। যামিনীনাথ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইত। ক্রমে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা এতটা বৃদ্ধি পাইল যে, করুণাময়ী উভয়কে সত্বর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য স্বামীকে তাড়া দিতে লাগিলেন।

যামিনীনাথ সেদিন মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া ইডেনগার্ডেনে বেড়াইতে

গিয়াছিলেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলায় উদ্যান তখন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। অধিকাংশই যুগলে যুগলে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাদের মৃদু গুঞ্জনে—কল হাস্যে নির্জ্জীব উদ্যান সজীব হইয়া উঠিতেছিল। ধীর বায়ুপ্রবাহে যুবতীর অলক মৃদু কাঁপিতেছিল, অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ রশ্মি আসিয়া পল্লবে পুষ্পে, যুবতীর ওষ্ঠে গণ্ডে রক্তরাগ মাখাইয়া দিতেছিল।

এক নিভৃত কুঞ্জের পাশে একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া যামিনীনাথ ও মনোরমা গল্প করিতেছিল।

যামিনীনাথ বলিলেন, "আমার বোধ হয়, অবরোধ হ'তে মুক্তি না পেলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হ'তেই পারে না।"

মনোরমা বলিল, "সে মুক্তিতে কিন্তু নারীর নারীত্ব অনেকটা খর্ব্ব হ'য়ে আসে।"

কথাটা শুনিয়া যামিনীনাথ এমনই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে বোধ হইল, তিনি যেন মনোরমার মুখে এমন কথাটা শুনিবার প্রত্যাশা আদৌ করেন নাই। তাঁহার সবিস্ময় দৃষ্টিপাতে মনোরমাও ইহা বুঝিল; বুঝিয়া বলিল, "এই যে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে তাদের এই হাস্য পরিহাস, এসকলের মধ্যে দূষণীয় বিবেচনা করবার কিছু নাই কি?"

দৃঢ়স্বরে যামিনীনাথ বলিলেন, "সার্টেন্‌লি নট্ (নিশ্চয়ই না)। তবে মন যাদের নীচ, তারাই এর ভিতর দোষের অনুসন্ধান করে।"

"কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংসারে যিশু বা বুদ্ধদেব এক আধ জনই জন্মে থাকে।"

মনোরমা শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিল। যামিনীনাথ একটু চুপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হ'লে অবরোধ প্রথার সমর্থন কর?"

মনোরমা পার্শ্ববিলম্বিত লতা হইতে একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া সেটাকে নখ দিয়া খুঁটিতে খুটিতে উত্তর দিল, "সমর্থন না করলেও অন্ততঃ তার ভিতর দোষের এমন কিছু দেখতে পাই না, যাতে সে প্রথাটাকে তুলে না দিলে সংসারের একটা ঘোরতর অমঙ্গল হ'তে পারে।"

বিস্ময়পূর্ণস্বরে যামিনীনাথ বলিলেন, "দোষ দেখতে পাও না? জীব মাত্রেই যে মুক্ত আলোক, মুক্ত বায়ু উপভোগের অধিকারী, যে নিষ্ঠুর প্রথায় তাদের সেই স্বাভাবিক অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রে রুদ্ধ গৃহে ক্রীত দাসীর ন্যায় রেখে দেয়, তাদের স্বাধীন চিন্তাটুকুর অবসর পর্য্যন্ত না দিয়ে চিত্তবৃত্তিটাকে ক্রমশঃ অজ্ঞতার অন্ধকারময় কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে, সে প্রথার মধ্যে তুমি কোন দোষ দেখতে পাও না?"

মনোরমা মৃদু হাসিল। সেই মৃদু হাসিটুকুর মধ্যে উপহাসের তীব্রতা দেখিয়া যামিনীনাথ লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মনোরমা গম্ভীর প্রশান্তস্বরে বলিল, "কেবল আপনি কেন, যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাঁরা সকলেই আপনার মত—অনেকে আবার আপনার অপেক্ষাও ভীষণভাবে অবরোধ প্রথার অপকারিতা বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু আপনাদের এই বর্ণনা যদি প্রকৃত হ'তো, তা হ'লে একদিন অবরোধ-বাসিনী রমণীদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হ'য়ে যেত।"

ক্ষুব্ধস্বরে যামিনীনাথ বলিলেন, "তবে কি তুমি এই বর্ণনাকে অতি-রঞ্জিত মনে কর?"

মনোরমা বলিল, "সম্পূর্ণ। কারণ অনেকগুলি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুক্ত রাজপথের বায়ু এবং মাঠের উন্মুক্ত আলোকের অভাবে তারা যে দিন দিন ধ্বংসের

পথে অগ্রসর হচ্চে, বা স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচালনার অভাবে তাদের মনটা অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবে যাচ্চে, এমন কোন প্রমাণই আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি নাই।"

যামিনীনাথ নীরবে বসিয়া ছড়ির আগা দিয়া আপনার জুতার উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। মনোরমা অদূরে দণ্ডায়মান হাস্য-কৌতুক-নিমগ্ন এক ইউরোপীয় যুগলের দিকে চাহিয়া রহিল।

যামিনীনাথ সহসা মনোরমার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতার মধ্যে কি কোনই সুফল নাই? এই যে স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে অবাধ ভাব-বিনিময়, এটাও কি তার একটা সুফল নয়?"

সহাস্যে মনোরমা বলিল, "স্ত্রীস্বাধীনতার মধ্যেও যে অনেক সুফল আছে একথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। কিন্তু স্ত্রীপুরুষে এই যে অবাধ ভাব-বিনিময়, এটাকে আমি তার কুফল ব'লেই জ্ঞান করি।"

যামিনীনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কুফল?"

মনোরমা বলিল, "এই ভাব-বিনিময়ের পরিণাম যে অনেক স্থলেই শোচনীয় আকার ধারণ করে, এবং স্থলবিশেষে যে বিয়োগান্ত নাটকে পর্য্যবসিত হয়, এ কথাটা বোধ হয় আপনিও অস্বীকার করতে পারবেন না।"

যামিনীনাথ মাথাটা নীচু করিয়া ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "দুই এক স্থলে শোচনীয় আকার ধারণ করলেও অধিকাংশ স্থলেই এটা হৃদয়ের যে প্রকৃত মিলন—যাকে ইংরাজীতে লভ্ বলা যায়, তার একমাত্র মূল হয়, সে বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই।"

একটু তীব্রস্বরে মনোরমা বলিল, "ময়দানের মাঝে দাঁড়িয়ে হাসি তামাসা না করলেই যে হৃদয়ের প্রকৃত মিলন হয় না, এ ধারণা অন্ততঃ

আমার নাই। হৃদয়ের প্রকৃত মিলন যা, তার জন্য এত আড়ম্বরের কোনই প্রয়োজন হয় না।”

“কিন্তু এই আড়ম্বর ব্যতীত হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় লাভের অবসর পাওয়া যায় না।”

“আড়ম্বরে হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং প্রকৃত ভাব যা, সেটাকে চাপা দিয়ে, বাইরে শুধু একটা অস্বাভাবিক অপ্রকৃত ভাব দেখিয়ে প্রলোভনের ফাঁদ পাতে মাত্র। হৃদয়ের প্রকৃত মিলন যা, তা এই সকল আড়ম্বরকে তুচ্ছ ক’রে এমনি নীরবে অনাড়ম্বর ভাবে সম্পন্ন হ’য়ে যায় যে, তাই দেখে এই সকল নিষ্ফল আড়ম্বরপ্রিয় প্রলোভন-দাতারাও হতবুদ্ধি না হ’য়ে থাকতে পারে না।”

শেষের কথাগুলা মনোরমা স্বরে এমনই একটা অস্বাভাবিক জোর দিয়া বলিল যে, তাহাতে যামিনীনাথের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মনোরমা অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলিল, “আপনার মনে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে আমি কোন কথা বলি নাই। আশা করি, আমার কথাগুলাকে আপনি তর্কের ভাবেই গ্রহণ করবেন।”

ম্লান হাসি হাসিয়া যামিনীনাথ বলিলেন, “যদি কোন আকার ইঙ্গিতে আমি তোমার মনে সে সন্দেহ উদয় হবার অবসর দিয়ে থাকি, তবে তার জন্য আমিই তোমার কাছে মাপ চাইচি। এবং তোমার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তিতে যে আমি মুগ্ধ হ’য়েছি, এ কথা তোমাকে আনন্দ সহকারে জ্ঞাপন কচ্চি।”

মনোরমা এই সহৃদয়তার জন্য যামিনীনাথকে ধন্যবাদ দিল।

যামিনীনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “কিন্তু এ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করার আগে ভেবে দেখা উচিত যে, প্রথাটা যদি

বাস্তবিকই নিন্দনীয় হ'তো, তা হ'লে সভ্যসমাজে কখনই প্রচলিত থাকতো না।"

মৃদু হাসিয়া মনোরমা উত্তর করিল, "আপনি যদি ইংরাজ সমাজকেই সভ্যসমাজের একমাত্র আদর্শ স্থির ক'রে কথাটা ব'লে থাকেন, তবে তার প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা থাকলেও আমি আপাতত সে ইচ্ছাকে দমন ক'রে শুধু এই মাত্র বলতে চাই, আজকাল ইংরাজসমাজেও এই স্ত্রীস্বাধীনতার যেরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হচ্চে, তাতে অনেক ইংরাজ মনীষীকেও এই প্রথার পরিবর্ত্তন জন্য চিন্তিত হ'তে হয়েছে।"

বারবার তর্কে পরাজিত হইয়া যামিনীনাথের আর তর্ক করিবার ইচ্ছা হইল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মনোরমাকে লইয়া যামিনীনাথ বাহিরে আসিলেন, এবং মোটরে উঠিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন।

মনোরমা যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরে আলো জ্বলিয়াছে। মনোরমার হাত ধরিয়া যামিনীনাথ বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দরজা পার হইয়াই স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সহসা সম্মুখে প্রেতযোনির বীভৎস আকার দেখিলে মানুষ যেমন ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠে, যামিনীনাথও তেমনই শিহরিয়া উঠিলেন।

ঘরের ভিতর ক্ষেত্রনাথ দরজার দিকে মুখ করিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়াছিল।

ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া মনোরমাও যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল সে যামিনীনাথের হাত হইতে নিজের হাতটা মুক্ত করিয়া, একটু অগ্রসর হইয়া মৃদু কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে, আপনি কখন্ এলেন?"

ক্ষেত্রনাথ এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে চাহিয়াছিল। এক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "কাল এসেছি।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মনোরমা বলিল, "ভাল আছেন?"

"হুঁ" বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, এবং ধীরে ধীরে যামিনীনাথের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। যামিনীনাথ ও মনোরমা উভয়েই নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরে যামিনীনাথ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা কি অসভ্য। একটা নমস্কার—"

বাধা দিয়া মনোরমা কঠোর স্বরে বলিল, "মাপ কর্ব্বেন, আমি বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, বিশ্রাম করবার অবসর চাই।"

যামিনীনাথের মুখখানা মুহূর্ত্তে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীর গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনোরমা অবসন্নভাবে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

খেতুর খেয়াল

দুর্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি হ'য়েছে খেতু ?"

উদাস স্বরে ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "কিছুই না।"

"আর তেমন পড়া শোনা করতে দেখি না যে ?"

"দিন রাত কি পড়া শোনা ভাল লাগে।"

"না পড়লে পাশ করবি কি ক'রে ?"

"পাশের ভাবনায় তো আমার রাত্রে ঘুম হয় না।"

ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া দুর্গাদেবী বিস্মিত হইলেন। যে ক্ষেত্রনাথ পড়ার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল, সেই ক্ষেত্রনাথের পড়ার উপর এই বিতৃষ্ণার কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর জন্যে তোর মন খারাপ হ'য়েছে বুঝি ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "বাড়ীতে মা বাপ ভাই বোন কত কি আছে, তাদের তরে মন খারাপ হবে বৈকি জেঠাইমা।"

এ উত্তরে দুর্গাদেবী শুধু অপ্রতিভ হইলেন না, একটু ব্যথিতও হইলেন। প্রসঙ্গটা ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "হাঁরে, দেব বাবুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি ?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া ক্ষেত্রনাথ উদাসভাবে উত্তর দিল, "গিয়েছিলাম।"

"তারা কি বললে ?"

"কি বলবে আবার।"

"সে কিরে, কিছুই বললে না ? এই তোকে এত ভালবাসে ?"

তাচ্ছীল্যের সহিত ক্ষেত্রনাথ বলিল, "হাঁ ভালবাসে! তুমিও যেমন জেঠাইমা, ওরা হ'লো বেহ্মজ্ঞানী, ওদের আবার ভালবাসা, ওদের আবার আত্মীয়তা!"

বিস্ময়ের সহিত দুর্গাদেবী বলিলেন, "আগে যে তুই ওদের কত প্রশংসা করেছিস্?"

রাগতভাবে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "প্রশংসা করেছি ব'লে ওদের আর কোন দোষ থাকতে নাই বুঝি?"

"কি দোষ আছে?"

"সবটাই দোষ। একটু লজ্জা সম্ভ্রম বা আবরু নাই; ধেড়ে ধেড়ে মেয়েগুলা যার তার সঙ্গে কথা কয়, গলা ছেড়ে গান গায়।"

চিবুকে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "গান গায় কিরে?"

জোর গলায় ক্ষেত্রনাথ বলিল, "শুধু গান! পর পুরুষের সঙ্গে ইয়ারকি দেয়, গাড়ী চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। ওদের কথা বোলো না জেঠাইমা, ওদের রকম সকম দেখে আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলে গিয়েছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দুর্গাদেবী ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা থাকৃগে বাছা, ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে হচ্চে না, ওদের ঘরে খেতেও হচ্চে না। পড়ার খরচ দিচ্চে, তুই পড়া শোনা শেষ ক'রে ফেল্।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আমার উপায় থাকলে জেঠাইমা, এ ভারটাও ওদের হাত হ'তে টেনে নিতাম। কিন্তু কি করবো।"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "আর করা-করিতে কাজ নাই, যেমন পড়া শোনা কচ্চিস্ তেমনি কর্।"

"কাজেই" বলিয়া ক্ষেত্রনাথ বিষণ্ণমুখে প্রস্থান করিল। দুর্গাদেবী তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। যে ক্ষেত্রনাথ দেবেন

বাবু ও মনোরমার প্রশংসায় শতমুখ হইত, সেই ক্ষেত্রনাথ কি জন্য সহসা তাঁহাদের উপর এতটা বিরূপ হইয়া উঠিল, অনেক ভাবিয়াও তিনি ইহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কেবল দুর্গাদেবী নয়, ক্ষেত্রনাথ নিজেও ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছিল না। দেশ হইতে ফিরিয়া সে যখন দেবেন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কোন আচরণই গর্হিত বলিয়া তাহার মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু দেবেন বাবু বা মনোরমার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া সে যখন যামিনীনাথের হাত ধরিয়া মনোরমাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিল, তখন হইতেই তাহার মনটা এই সমাজের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। রাগটা এত বেশী হইল যে, মনোরমার সাক্ষাতেও সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, একটা অস্বাভাবিক ঘৃণার ভাব দেখাইয়া নিতান্ত রূঢ়ভাবেই গৃহত্যাগ করিল। গৃহত্যাগকালে মনোরমাকে একটা নমস্কার করিয়া ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষার কথাটা পর্য্যন্ত তাহার মনে রহিল না।

সেখান হইতে বাহির হইয়া ক্ষেত্রনাথ সমস্ত পথটাই উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে অতিবাহন করিল। ছি ছি, ইহাদের কি একটুও সম্ভ্রমজ্ঞান নাই! এত বড় মেয়ে একজন সাহেব-বেশধারী যুবকের হাত ধরিয়া তাহার সহিত অসঙ্কোচে হাস্যালাপ করিতে পারে! কোন হিন্দুর ঘরে এমন ব্যাপার ঘটিলে—ওঃ, সে কি ভয়ানক কাণ্ডই হইয়া যাইত। তাহা হইলে ক্ষেত্রনাথই কি এই নির্লজ্জ ব্যাপারটাকে এমনই নীরবে উপেক্ষা করিয়া আসিতে পারিত! কিন্তু এ যে ভিন্ন সমাজ; এ সমাজের কোন কথায় কথা কহিবার অধিকার তাহার নাই। নতুবা—ক্ষেত্রনাথ রুদ্ধরোষে [illegible]লিতে ফুলি[illegible] ঘরে ফিরিল।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সম্পূর্ণ নূতন? ক্ষেত্রনাথ কতদিন কত ব্রাহ্ম মহিলাকে নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সহিত ভ্রমণ বা হাস্যালাপ করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তো তাহার এমন রাগ হয় নাই? ব্রাহ্ম সমাজের উহাই রীতি বলিয়া সে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজিও এই ব্যাপারটাকে তাহার তেমনই উপেক্ষা করিয়া আসা উচিত ছিল, কিন্তু কেন যে তাহা করিতে পারে নাই, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

না বুঝিলেও কিন্তু ক্ষেত্রনাথের মনের ভিতর বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। কিছুই তাহার ভাল লাগিল না, পড়ায় মন বসিল না, বিরক্তি আসিল। এমন কি, দেবেন বাবুর সহিত সংস্রব পর্য্যন্ত যেন নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল। ঘরে মন টিকিল না, পথে বাহির হইল।

রাস্তায় তখন আলো জ্বলিতেছে, শত শত লোক পথ বাহিয়া চলিতেছে। কেহ কর্ম্মক্লান্ত দেহ লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, কেহ বা সাজসজ্জা করিয়া নৈশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। ফেরীওয়ালা বেলফুল হাকিয়া চলিয়াছে, বরফওয়ালা খরিদদার ডাকিতেছে, খবরের কাগজ-ওয়ালারা চীৎকার করিতে করিতে রাস্তার এমাথা হইতে ও মাথা পর্য্যন্ত ছুটাছুটী করিতেছে।

ক্ষেত্রনাথ চলিতে চলিতে একেবারে গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। সেখানেও অসংখ্য লোক। পাঁচ সাত জনে মিলিয়া কোথাও খোসগল্প করিতেছে, কোথাও ধর্ম্মচর্চ্চা চলিয়াছে, কোন স্থান হইতে হাস্যের ফোয়ারা উত্থিত হইতেছে। ক্ষেত্রনাথ গিয়া একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে বসিল। অদূরে বসিয়া জনৈক যুবক ধীর মৃদুকণ্ঠে গাহিতেছিল,—

"আমারে আসতে ব'লে এত অপমান করা।"

ভ্রূকুটী করিয়া ক্ষেত্রনাথ খানিকটা দূরে গিয়া বসিল।

সে রাত্রে ক্ষেত্রনাথ ক্ষুধা নাই বলিয়া কিছু খাইল না, সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিল, যেন তাহার একদিকে নিমি, অপর দিকে মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিমি চোখ রাঙ্গাইয়া, মুখ ঘুরাইয়া বলিতেছে, "মা তোমাকে এত খাওয়ালে, এত দিলে, আর তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে যেতে পারলে না? ছিঃ!"

ক্ষেত্রনাথ ভ্রূভঙ্গী করিয়া মনোরমার দিকে ফিরিল। মনোরমা কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না, একটা কথাও বলিল না। নিমি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিল, "কেমন, ঐ বেহ্ম মেয়েটার ভালবাসা দেখলে তো? কেমন অপমান!"

উত্তরে ক্ষেত্রনাথ নিমিকে কি একটা কড়া কথা বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না, গলা দিয়া একটুও স্বর বাহির হইল না। নিমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষেত্রনাথ তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ধরিতে ছুটিল। কিন্তু দুই পা না যাইতেই পায়ে পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া গেল। নিমি আরও জোরে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

ক্ষেত্রনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। ময়লা ফেলার গাড়ীগুলা বিকট শব্দ করিতে করিতে জানালার পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহে সম্মতি

অবসন্নভাবে খানিক পড়িয়া থাকিয়া মনোরমা যখন মনটাকে স্থির করিতে পারিল, তখন সে আপনার এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনে আপনিই লজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। ছি ছি, তাহার একি দুর্ব্বলতা! মাষ্টার মশায়কে দেখিয়া সে এতটা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল কেন? সে কি এমন অন্যায় কাজ করিয়াছে, যাহাতে তাহার এতটা বিহ্বল হইয়া পড়া অস্বাভাবিক হয় নাই? তাহার অস্বাভাবিকতায় ঘোষ সাহেবই বা কি মনে করিবেন? ইহাতে তাঁহার মনে কি এমন কোন একটু সন্দেহের উদ্রেক হইবে না, যে সন্দেহটা নিতান্ত অমূলক, অস্বাভাবিক, অথচ নিন্দনীয়? তাঁহার নিকট মনোরমার আত্মগরিমা কি একটুও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে না?

মনোরমা ত্রস্তে উঠিয়া বসিল, এবং ব্যস্তভাবে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতার পাঠকক্ষে প্রবেশ করিল।

দেবেন্দ্র বাবু তখন উপাসনা শেষ করিয়া একখানা বাঙ্গালা বহি লইয়া পাঠ করিতে বসিয়াছিলেন। মনোরমা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে তাঁহার পাশের চৌকীতে আসন গ্রহণ করিল। দেবেন্দ্র বাবু পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ভেবেছিলাম, আজ এক সঙ্গে উপাসনা করবো। কতকক্ষণ অপেক্ষাও করেছিলাম, কিন্তু তোর বিলম্ব দেখে—"

কুণ্ঠিতভাবে মনোরমা বলিল, "হাঁ বাবা, আজ আমার অনেকটা বিলম্ব হ'য়ে গেল।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তা হ'তেই পারে, সে জন্য কুণ্ঠিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।"

মনোরমা পিতার সম্মুখস্থ পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি বই বাবা ?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন,"এখানা কেশব বাবুর লেকচারের বঙ্গানুবাদ।"

"আমি শুনলে বুঝতে পারব না ?"

"খুব পারবে। তবে অনুবাদে সকল স্থানে মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। তা হ'লেও মোটের উপর ভাবটা আছে।"

দেবেন্দ্র বাবু পুস্তকের একটা জায়গা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনোরমা স্থিরভাবে বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিল। যে স্থানগুলা দুর্ব্বোধ, দেবেন্দ্র বাবু ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল স্থান বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

খানিকপরে করুণাময়ী আসিয়া সম্মুখের একখানা চেয়ার অধিকার করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু পাঠ বন্ধ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, করুণাময়ী বলিলেন, "একটা দরকারী কথা আছে।"

দেবেন্দ্র বাবু কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মনোরমা উঠিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল। দেবেন্দ্র বাবু অধীত স্থলে চিহ্ন রাখিয়া বইখানা মুড়িয়া ফেলিলেন, এবং চশমা খুলিয়া বেশ সোজা হইয়া বসিলেন। করুণাময়ী টেবিলের উপর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, "মনোর বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হ'য়ে গেলে ভাল হয়।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এত ব্যস্ততার কোন কারণ আছে কি ?"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে করুণাময়ী বলিলেন, "সকল কাজেরই কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সংসারে কাজ করা দুর্ঘট হ'য়ে উঠে।"

সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "অথচ কারণ ব্যতীত একটা কাজও ঘটতে পারে না।"

করুণাময়ী কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হয়, বিলম্বে এমন সুপাত্রটী হাত-ছাড়া হ'তে পারে।"

দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সুপাত্র ?"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে করুণাময়ী বলিলেন, "তুমি যে কি ক'রে প্রফেসারী ক'রেছিলে তাই ভাবি।"

মৃদু হাসিয়া দেবেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "প্রফেসারীতে পাত্র পাত্রীর চিন্তা একদিনও উঠে নাই।"

"আমি যামিনীর কথা বলছি।"

সচেতনভাবে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ওঃ যামিনী! তা তার হাতছাড়া হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্চে কি ?"

করুণাময়ী বলিলেন, "হাতছাড়া হ'তেই কতক্ষণ। বড় লোকের ছেলে, তার উপর ব্যারিষ্টার। কত সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে তাকে পাবার জন্য লালায়িত।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "অথচ সে আমার এই কুশ্রী কুরূপা মেয়েটীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত।"

ব্যঙ্গের স্বরে না বলিলেও কথাটা ঠিক ব্যঙ্গের মতই শুনাইল। করুণাময়ী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তোমার এই মেয়েটী যে তার আদৌ উপযুক্ত নয় এ কথাটা বোধ হয় তুমি একবারও মনে কর না।"

দেবেন্দ্র বাবু ধীর প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "আমি যা বুঝি না, তা কখন মনে করবারও চেষ্টা করি না। যাক্, তা হ'লে এ বিবাহে যামিনীর মত আছে ?"

"হাঁ, সে আমার কাছে এক রকম সম্মতিই দিয়েছে।"

"মনো?"

"মনোরও মত আছে বৈকি। মত না থাকলে তার সঙ্গে হাসিগল্প করে, বা বেড়াতে যায়?"

"গাড়ী চড়ে বেড়ালে বা হাসিগল্প করলেই যে বিবাহে সম্মত হবে এমন বিশ্বাস আমার নাই।"

রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে করুণাময়ী বলিলেন, "তবে তোমার বিশ্বাসের জন্য আবার কি করতে হবে?"

"কিছুই না, আমি শুধু স্পষ্ট শুনতে চাই।"

"স্পষ্ট স্বীকার যদি না করে?"

দেবেন্দ্রবাবু নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। করুণাময়ী দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমার বিশ্বাস, তার মত আছে।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বিশ্বাস জিনিষটা প্রায়ই সকলের সমান হয় না।"

করুণাময়ী কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাকে ডাকাচ্চি। বেয়ারা!"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আজ থাক্।"

উত্তেজিতকণ্ঠে করুণাময়ী বলিলেন, "না, আমি এখনি কথাটার একটা শেষ মীমাংসা কত্তে চাই। একজন ভদ্রলোককে বৃথা আশ্বাস দিয়ে রাখা আমি সঙ্গত বোধ করি না। বেয়ারা!"

বেয়ারা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। করুণাময়ী মনোরমাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাহাকে আদেশ দিলেন। বেয়ারা চলিয়া গেল। করুণাময়ী স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমার মতে কিন্তু ওদের বিবেচনা করবার আরও কিছু সময় দেওয়া উচিত ছিল।"

তীব্রস্বরে করুণাময়ী বলিলেন, "কিছুমাত্র না। এরূপ দীর্ঘসূত্রতা আমার একেবারেই অসহ্য।"

সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "জগতের এমন কতকগুলা নিয়ম আছে, যেগুলা ঠিক জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত। তোমার আমার অসহ্য হ'লেও সেগুলা ঠিক নিয়মই থাকবে। তাড়াতাড়িতে শুধু মস্ত একটা ভুল হবে মাত্র।"

রোষপ্রদীপ্ত কণ্ঠে করুণাময়ী বলিলেন, "হয় হোক, আমি কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত সময় দিতে প্রস্তুত নই। এ ব্যাপারের আজই যা হয় একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক্।"

দেবেন্দ্রবাবু আর কিছু বলিলেন না। একটু পরে মনোরমা আসিয়া তাঁহার পাশে দাড়াইল। করুণাময়ী তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপিত করিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা যামিনীনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। আশা করি এ বিবাহে তোমার—"

বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এত ব্যস্ত না হ'য়ে—"

তীব্রকণ্ঠে করুণাময়ী বলিলেন, "এর নাম ব্যস্ততা নয়, কাজ।"

তারপর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খুব সম্ভব এ বিবাহে তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।"

মনোরমা নতমস্তকে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "না।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমাদের উপরোধ অনুরোধ কিছু মাত্র নাই। তুমি তোমার নিজের সঙ্গে বেশ বোঝাপড়া ক'রে—"

মনোরমা তেমনই নতমস্তকে মৃদু কম্পিতস্বরে বলিল, "আমি বুঝে দেখেছি বাবা।"

স্বামীর মুখের উপর গর্ব্বপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করুণাময়ী বলিলেন, "আশা করি, অতঃপর তোমারও আর প্রতিবাদের কোন কারণ থাকবে না।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই করুণাময়ী সদম্ভ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। মনোরমা তেমনই মুখ নীচু করিয়া নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবেন্দ্র বাবু ডাকিলেন, "মনো!"

মনোরমা একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াই পুনরায় দৃষ্টি নত করিল। দেবেন্দ্র বাবু হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিলেন, এবং বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "কেন এমন অন্যায় মত দিলি মা?"

বাপের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া মনোরমা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্র বাবু তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে ধীর শান্তস্বরে বলিলেন, "তা কিছুতেই হ'তে পারে না মা, তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোকে আমি পৃথিবীর সম্রাটের হাতেও দিতে পারি না।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "কিন্তু বাবা, তাতে তোমাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে—"

ঈষৎ হাসিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমার লাঞ্ছনা! সন্তানের জন্য কত লাঞ্ছনা সহ্য করা যায়, তা ছেলে না হ'লে তো বুঝতে পারবে না মা!"

মুহূর্ত্তের জন্য মনোরমার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল মৃদু হাস্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনের উপর ক্ষণিক মেঘমুক্ত সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িল। দেবেন্দ্রবাবু স্নেহপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাখ্যাত

মনোরমা ভাবিয়াছিল, যামিনীনাথের সহিত বিবাহে মত দিলেই তাহার সকল লজ্জা, সকল দুর্ব্বলতা, চাপা পড়িয়া যাইবে। ক্ষুদ্র মাষ্টার ক্ষেত্রনাথের সহিত তাহার যে কোন সম্পর্কই নাই, সে শুধু তাহার করুণার পাত্র, ইহাই সকলের নিকট প্রতিপন্ন করিবে। এই জন্যই সে তাড়াতাড়ি বিবাহে সম্মতি দিয়া আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এই সম্মতির ভিতর, এই একটী ক্ষুদ্র "হাঁ" শব্দের মধ্যে জীবনের কতখানি সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তখন পায় নাই।

যখন অবসর পাইল, তখন দেখিল একটা সামান্য লজ্জাকে চাপা দিবার জন্য সে কি ভয়ানক কাজ করিয়াছে। সে কোন দিনই যামিনী নাথকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। তথাপি যে ইদানীং সে যামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখাইত, তাহা শুধু ভদ্রতার খাতিরে, ভদ্র লোকের সম্মান রক্ষার জন্য। যামিনীর উপর তাহার যে একটুও ভালবাসা জন্মে নাই, তাহাকে ভালবাসিবার কল্পনা পর্য্যন্ত কোনদিন মনে স্থান পায় নাই ইহা তাহার নিজের অবিদিত ছিল না। কিন্তু শুধু একটা ঝোঁকের মাথায় সেই যামিনীনাথের সহিত বিবাহে খুব সহজ-ভাবেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

ঝোঁকের কারণটা নিতান্ত সামান্য নয়। সেদিন সে সহসা ক্ষেত্র-নাথকে দেখিয়া যামিনীনাথের সম্মুখে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল,

তাহাতে যামিনীনাথের স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে, সে ক্ষেত্রনাথের উপর অনুরাগিণী। কিন্তু ছিঃ, ক্ষেত্রনাথের মত একজন উচ্চ শিক্ষাবিহীন গ্রাম্য যুবককে ভালবাসে, যামিনীনাথের মনে এই সন্দেহের উদয় হইলে তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে। আর এই সন্দেহজনক ব্যাপারটা যে শুধু যামিনীনাথের মনেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, শীঘ্রই বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িবে ইহাও মনোরমা স্থির জানিত। তাহা হইলে তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান আর থাকিত না; শুধু লজ্জা নয়, মাতার তিরস্কারে কেবল সে একা নয়, পিতাকে পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতে হইত। এই লজ্জাজনক ব্যাপারটাকে চাপা দিবার জন্যই মনোরমাকে বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মতি দিতে হইল।

কিন্তু তারপর? যদি যামিনীনাথকেই বিবাহ করিতে হয়? মাতা যেরূপ ব্যস্ততার সহিত উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাহাই সম্ভব। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কথাটা ভাবিতেও মনোরমা শিহরিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, নিজের জিভটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এই 'হাঁ' কথাটাকে 'না' করিবার কি কোন উপায় নাই? যদি কাগজের লেখা হইত, তাহা হইলে মনোরমা এতক্ষণ অসঙ্কোচে হ অক্ষর কাটিয়া তাহার স্থলে ন অক্ষর লিখিয়া দিত। এই একটা হাঁ কথাকে না করিবার জন্য মনোরমার মনটা আছাড়ি পিছাড়ি করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবু ছাড়া আর কেহই তাহার এই মানসিক ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিল না।

মনোরমার বিবাহে সম্মতি দানটা যে আন্তরিক নহে, ইহা দেবেন্দ্র বাবু গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং মনোরমা মত দিলেও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে

পাছে তাঁহাকে পাঁচ কথা শুনিতে হয়, পাছে এই প্রসঙ্গে ক্ষেত্রনাথের কথাটা উঠিয়া পড়ে, এই সকল আশঙ্কায় মনোরমা এমনই জোর করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিল যে, দেবেন্দ্র বাবু মনের সন্দিগ্ধ ভাবটুকু মনে চাপিয়া মঙ্গলময়ের উপর নির্ভর করিলেন।

কিন্তু মনের উপর জোর খাটিল না। সেখানে হারিয়া মনোরমা উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভাবিল, যামিনীনাথকে সকল কথা খুলিয়া বলিবে। কিন্তু ছিঃ, যাহাকে সে আদৌ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে না, তাহার নিকট এতটা হীনতা স্বীকার করিবে? উঃ, কি কুক্ষণেই মনোরমা সে দিন বেড়াইতে গিয়াছিল! কি কুক্ষণেই ক্ষেত্রনাথ আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছিল!

সম্মুখে টেবিল হার্ম্মোনিয়মটা খোলা ছিল, কিন্তু মনোরমা তাহা বাজাইতেছিল না। হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া মনটাকে একটু শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে বাজাইতে বসিয়াছিল; কিন্তু তাহার চাবি টানিয়া, বেলোতে পায়ের চাপ দিয়া পদ্দা টিপিবামাত্র হার্ম্মোনিয়মটা এমনই বিকট আওয়াজে চেঁচাইয়া উঠিল যে, ঐ দূরবর্ত্তী বস্তির খোট্টা মাগীগুলা বাড়ীতে কেহ মরিলেও এমন বিকট রবে কাঁদিয়া উঠে না। মনোরমা তাড়াতাড়ি বেলো হইতে পা সরাইয়া লইল; এবং পর্দ্দার উপর কনুইএর ভর দিয়া, হাতের তেলোয় দাড়ীটা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সম্মুখের জানালা দিয়া অপরাহ্নের এক ঝলক রোদ আসিয়া তাহার কাঁধে পড়িল।

সহসা পশ্চাতে জুতার মস্‌মস্‌ শব্দ শুনিয়া মনোরমা চমকিত ভাবে ফিরিয়া চাহিল, এবং চাহিতেই যামিনীনাথের হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানা দেখিতে পাইল। মনোরমাও একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। যামিনীনাথ মনোরমার চৌকীর পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া

লইয়া বসিলেন। মনোরমা মুখ নীচু করিয়া হার্মোনিয়মের পর্দ্দার উপর আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল।

যামিনীনাথ সহাস্যে বলিলেন, "আমিও আশা ক'রেছিলাম, এই ঘরেই তোমাকে একা দেখতে পাব।"

মনোরমা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এইমাত্র আসচেন?"

যামিনীনাথ বলিলেন, "প্রায় বিশমিনিট হ'লো এসেছি। এতক্ষণ জেঠাই-মার ঘরে ছিলাম। কিন্তু তিনি যে রকম ব্যস্ত—"

মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া যামিনীনাথ ঈষৎ হাসিলেন, এবং প্রত্যুত্তরে তাহার মুখে বোধ হয় এইরূপই একটু হাসি দেখিবার প্রত্যাশা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না, মনোরমা মুখখানা বরং আর একটু ফিরাইয়া লইল। যামিনীনাথ বুঝিলেন, ইহা স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জা। সুতরাং তিনি জানালার দিকে চাহিয়া সমান হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "জেঠাইমা শুধু নিজে ব্যস্ত নয়, আমাকে পর্য্যন্ত ব্যস্ত ক'রে তুলেছেন। আমার বোধ হয় এ-টা তাড়াতাড়ির কোনই প্রয়োজন ছিল না।"

সহসা মনোরমা মুখ তুলিয়া কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিল, "সত্য?"

কথাটা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। যামিনীনাথ চমকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সত্য?"

মনোরমা নিরুত্তর। যামিনীনাথ বুঝিলেন, এটা বিদ্রূপ মাত্র। তিনি মনে মনে মৃদু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ এই যে, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যামিনীনাথ বলিলেন, "তোমাকে এখন একটা গান শোনাবার জন্য অনুরোধ করলে সেটা নিতান্ত অন্যায় হবে কি?"

মনোরমা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু সে সোজা হইয়া বসিল, এবং হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া ধীরে ধীরে গাহিতে আরম্ভ করিল,—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।

কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।"

যামিনীনাথ মুগ্ধদৃষ্টিতে মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গীতস্রোত তাঁহার কাণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনোরমা গাহিয়া যাইতে লাগিল,—

"ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে,
পাই যদি আমি তোমারে দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে।"

গান শেষ হইলে যামিনীনাথ ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মসঙ্গীতও বেশ মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে ভালবাসার গান যে আরও মিষ্টি শোনাবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে আজ আর তোমাকে সে কষ্ট দিতে অনুরোধ বা ইচ্ছা করি না, কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যে দিন তোমার এই কষ্ট স্বীকারটুকু একটা কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়াবে। আমি সেই দিনের প্রতীক্ষাতেই আপাতত যথেষ্ট আনন্দলাভ করতে পারবো।"

যামিনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে সাগ্রহে মনোরমার হস্তস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মনোরমা এমনই ত্রস্তভাবে হাতখানা সরাইয়া লইল যে, যামিনীনাথ বিস্ময়ে এক পা পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমা একটী কথাও বলিল না, শুধু নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় একবার কাতর দৃষ্টিখানি তুলিয়াই আবার তাহা নত করিল। তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া যামিনীনাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তিনি মনোরমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

মনোরমা উত্তর দিল, "বলুন।"

"আমি শুনেছিলাম, তুমি নিজমুখে আমাদের বিবাহে সম্মতি দিয়েছ।"

"হাঁ।"

"তা হ'লে অবশ্য এমন আশাও করতে পারি যে, সে সম্মতি স্বেচ্ছা এবং পরস্পর ভালবাসার উপর দিয়েই হ'য়েছে।"

কম্পিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে মনোরমা উত্তর দিল, "না।"

যামিনীনাথ বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। মনোরমা ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। একটু পরে চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া যামিনীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে কি আমাকে বুঝতে হবে যে, তুমি এক্ষণে এ বিবাহে অসম্মত ?"

সকাতর কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "আমাকে মাপ করুন।"

"কিন্তু এই অসম্মতির কারণ কি শুনতে পাই না ?"

"না।"

"অবশ্য, শুনবার মত হ'লে শুনতে পেতাম।"

মনোরমা নিরুত্তর। তীব্র কঠোর স্বরে যামিনীনাথ বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে কি আমাকে এরূপ সন্দেহ করতে বাধ্য হ'তে হবে না যে, সেই হতভাগা মাষ্টার ছোঁড়াই এর মূল ?"

মনোরমা এবার মুখ তুলিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "আপনার মত উচ্চ শিক্ষিতের মুখে এমন নীচতাপূর্ণ কথা শুনবার প্রত্যাশা করি না।"

গর্জ্জন করিয়া যামিনীনাথ বলিলেন, "আর আমিও তোমার মত শিক্ষিতা মহিলার নিকট এতটা নীচ ব্যবহারের আশা করি নাই।"

যামিনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং টুপীটা মাথায় দিয়া উন্মাদের ন্যায় অস্থির পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভৃত্যেরা সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যামিনীনাথ একেবারে দরজা পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু রাস্তায় আসিতেই যামিনীনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল। দেখিলেন, ঠিক তাঁহারই সম্মুখ দিয়া ক্ষেত্রনাথ সেই বাড়ীতে ঢুকিবার উপক্রম করিতেছে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেমন সহসা শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, যামিনীনাথও তেমনই ভাবে সহসা গিয়া ক্ষেত্রনাথকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহাকে বুঝিবার অবসর না দিয়াই তাহার কপালে এক প্রচণ্ড ঘুসি মারিলেন। রাস্তার লোকেরা ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কিন্তু প্রহারকর্ত্তার সাহেব-বেশ দেখিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না।

সহসা ঘুসী খাইয়া ক্ষেত্রনাথ একটু টলিয়া পড়িল। সাহেব দ্বিতীয় ঘুসী তুলিলেন। কিন্তু সে ঘুসী পড়িবার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রনাথ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সাহেবের ঘুসী সমেত হাতটা এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে, সাহেব সে হাতটা আর নাড়িতে পারিলেন না। সাহেব তখন পা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া দুই হাত দিয়া সাহেবকে জড়াইয়া ধরিল, এবং একটা ঝাঁকুনি দিয়া ছেলেরা যেমন শোলার পুতুল ছুড়িয়া দেয় তেমনই ভাবে তাঁহাকে ছুঁড়িয়া দিল। যামিনীনাথ দুই তিন হাত দূরে গিয়া পড়িলেন। রাস্তায় তখন লোক জমিয়া গিয়াছিল। তাহারা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। ভৃত্যদের চীৎকারে ও রাস্তার লোকের কলরবে দেবেন্দ্র বাবু জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাড়ীর মেয়েরাও আসিয়াছিল। তাহারা হায় হায় করিয়া উঠিল।

যামিনীনাথ পড়িয়া বেশ একটু আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে আঘাতজনিত ব্যথাটুকু গোপন করিয়াই তাঁহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। সেই মাত্র রাস্তায় জল দিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পরিচ্ছদ কাদায় মাখামাখি হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে "পোলিশ, পোলিশ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। এদিকে রাস্তার লোকদের বিদ্রূপপূর্ণ কলরবে সাহেব উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাহায্যের প্রত্যাশায় উপরের দিকে চাহিতেই মনোরমার তীব্র হাস্যপূর্ণ মুখখানা দৃষ্টিপথে পড়িল। যামিনীনাথ আর দাঁড়াইলেন না, অস্বাভাবিক দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। একটা লোক চীৎকার করিয়া বলিল, "ও সাহেব, তোমার টুপী রইল পড়ে।"

সাহেব কিন্তু আর পাছু ফিরিয়া চাহিলেন না। সহসা দূরে পাহারা-ওয়ালার লালপাগড়ী দেখা গেল। যেমন দেখা, অমনি ভিড়ও কমিতে থাকিল। জনতা দেখিয়া পাহারাওয়ালা সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্র বাবু নামিয়া আসিলেন, এবং ক্ষেত্রনাথের হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ভূত নামিল

ক্ষেত্রনাথ চিঠী লিখিতেছিল, লিখিতে লিখিতে সহসা এমনই উচ্চ-শব্দে হাসিয়া উঠিল যে, দরজার বাহিরে কুকুরটা শুইয়াছিল, সে ভীতি-সূচক চীৎকার করিতে করিতে দশহাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেত্রনাথ কয়েক দিন পরে আজ আপন মনে প্রাণ ভরিয়া খুব খানিকটা হাসিল।

কয়দিন ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে ক্ষেত্রনাথ যখন বুঝিতে পারিল, তাহার আচরণটা নিতান্ত গর্হিত হইতেছে, তখন আপনার আচরণে আপনিই লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে কি স্বপ্নের ঘোরে পড়িয়াছে? মনোরমার সহিত তাহার সম্পর্ক কি? তাহারা ব্রাহ্ম, সে হিন্দু, তাহারা ধনী, সে দরিদ্র, তাহারা দাতা, সে তাহাদের দ্বারে ভিক্ষুক মাত্র। সুতরাং মনোরমার সহিত তাহার এমন কোন সম্বন্ধই নাই যাহাতে সে তাহাকে কোন দিক্ দিয়াই আত্মীয় ভাবিয়া লইতে পারে। অথচ এই মনোরমার জন্যই সে কি না করিয়াছে? স্নেহময় বৃদ্ধ দাদা মহাশয়ের প্রাণে আঘাত দিয়াছে, পিসীমার প্রাণে আঘাত দিয়াছে, মাসীমার বুকে আঘাত দিয়া আসিয়াছে। ছি ছি, কি পাগলামি!

ক্ষেত্রনাথ অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দাদা মহাশয়কে একখানা চিঠী লিখিতে বসিল। কিন্তু খানিকটা লিখিবার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ আবার কি পাগলামি! সে তো এমন কোন অন্যায় আচরণ করিয়া আসে নাই যাহাতে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হইতে পারে। দাদামশায় নিমির সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধ

স্থির করিয়াছেন, কিন্তু সে তো সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া আসে নাই, সময় লইয়া আসিয়াছে মাত্র। সেজন্য এত ভণিতা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার দরকার কি? এ আবার পাগলামির উপর কি ভয়ানক পাগলামি!

ক্ষেত্রনাথ আপনার পাগলামিতে আপনিই হাসিয়া উঠিল। তারপর চিঠিখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, এবং ঘরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিল।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ক্ষেত্রনাথ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "জেঠাইমা, জেঠাইমা!"

দুর্গাদেবী তখন রন্ধনশালায় বসিয়া ছেলেদের বৈকালিক খাবারের আয়োজন করিতেছিলেন। ক্ষেত্রনাথের ডাক শুনিয়া উত্তর দিলেন, "কি রে খেতু!"

ক্ষেত্রনাথ চটীজুতাটা উঠানে খুলিয়া রাখিয়া রান্নাঘরের দরজার উপর উঠিল, এবং ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে জেঠাইমা, কিছু খাবার আছে?"

যে ক্ষেত্রনাথকে কয়দিন সাধিয়া খাওয়াইতে হইতেছিল, আজি সহসা তাহার ক্ষুধার উদ্রেক শুনিয়া দুর্গাদেবী শুধু বিস্মিত হইলেন না, একটু হৃষ্টও হইলেন। হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "তবু ভাল। আজ কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলাম রে?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "এখানে আর ঘাট কোথায় পাবে জেঠাইমা, ঐ তো এক কল। তা যেখানেই মুখ ধোও, আমাকে কিন্তু খুবই ক্ষিদে পেয়েছে।"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "কি খাবি? ভাত তো এখন খাবি না?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "এক সূর্য্যে দু'বার ভাত খেতে আছে?"

দুর্গা। তবে একটু বোস্, আমি রুটী খানকতক ভেজে দিই।

ক্ষেত্র। ওঃ, সে অনেক দেরী, তুমি এই তো ময়দায় জল দিয়েছ?

দুর্গা। তা দিলেই বা। আমি আগে খানকতক বেলে তোকে ভেজে দিচ্চি।

দুর্গাদেবী ব্যস্তহস্তে কয়েকটা লেচী কাটিয়া লইয়া রুটী বেলিতে বসিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তুমি খান দুই ড'লে নিয়ে কড়া চাপাও, বাকীগুলো আমি ড'লে দিচ্চি।"

ঈষৎ হাসিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "তুই ড'লে দিবি! তা হ'লে আমার ভাবনা ছিল কি?"

ক্ষেত্রনাথ সগর্ব্বে বলিল, "আমি এতই অকর্ম্মণ্য নাকি? আচ্ছা, আমি পারি কি না দেখ।"

ক্ষেত্রনাথ গিয়া জেঠাইমার হাত হইতে ডলনটা কাড়িয়া লইল, দুর্গাদেবী হাসিতে হাসিতে যে দুই তিন খানা রুটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই লইয়া উনানে কড়া চাপাইয়া দিলেন। ক্ষেত্রনাথ রুটী ডলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একখানা রুটী ডলিতে গিয়াই ক্ষেত্রনাথ এ কাজে আপনার পারদর্শিতার অভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল। রুটীখানা কিছুতেই গোলাকার হইল না, কখনও ত্রিভুজ, কখন বা ষড়ভুজ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইহার উপর ডলনের প্রবল আঘাতে পাথরের চাকীখানা এমনই অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তদ্দর্শনে দুর্গাদেবী না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রক্ষে কর্ খেতু, আর তোর বাহাদুরী দেখাতে হবে না, শেষে কি চাকীখানাও যাবে।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "সত্যি জেঠাইমা, মানুষ ইচ্ছা করলেই সকল কাজ পেরে উঠে না।"

যে কয়খানা রুটী ভাজা হইয়াছিল, সেই কয়খানা থালায় করিয়া দিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "সবাই সব কাজ পারলে ভাবনা ছিল কি? তুই খেতে বোস্, আমি আবার ভেজে দিচ্চি।"

ক্ষেত্রনাথ খাইতে বসিল, দুর্গাদেবী পুনরায় খানকতক রুটী ডলিয়া লইয়া সেঁকিতে বসিলেন। সেঁকিতে সেঁকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে খেতু, ক'দিন তোর কি হ'য়েছিল? বাড়ীর জন্যে বুঝি মনটা খারাপ হ'য়েছিল?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "মনটা খারাপ হ'য়েছিল বটে, জেঠাইমা, তবে সেটা ঠিক বাড়ীর জন্যে নয়।"

"তবে কি জন্যে?"

"কি জন্যে যে, তা ঠিক বলতে পারব না, তবে আমার ঘাড়ে একটা ভূত চেপেছিল।"

"তারপর?"

"তারপর ভূতটা যেমন হঠাৎ চেপেছিল, তেমনি আজ হঠাৎ নেমে গেল।"

দুর্গাদেবী ঈষৎ শঙ্কিত স্বরে বলিলেন, "তা বাপু, তুই আর রাত ভিত গঙ্গার ধারে যাস্ না। সেদিন গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা অবধি তোর এই রকমটা হ'য়েছিল।"

ক্ষেত্রনাথ সহাস্যে বলিল, "এ গঙ্গার ধারের ভূত নয় জেঠাইমা, এ কি জান, সেই যাকে বলে—'এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ব্যথা।' এমনি ক'রেই মানুষ পাগল হয় আর কি। ও কি

জেঠাইমা, রক্ষা কর, তুমি দেখছি ঐ এক সের ময়দা আমার পেটেই দেবে।"

তিরস্কারের স্বরে দুর্গাদেবী বলিলেন, "তুই এক সের ময়দা খাবি, কপাল আমার! একটু গুড় দিচ্চি, ক'খানা খেয়ে নে। ক'দিন কি তোর খাওয়া ছিল? ক'টা দিনেই যেন আধখানা হ'য়ে গেছিস্।"

হাসিতে হাসিতে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "ভয় নাই জেঠাইমা, দিনকতক তোমার কাছে রুটী খেতে বসলেই আবার দেড়খানা দু'খানা হ'য়ে যাব।"

"ছেলের কথা দেখ" বলিয়া দুর্গাদেবী পুনরায় ময়দা মাখিতে বসিলেন। ব্রজসুন্দরী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুটী হ'লো দিদি, ধীরের ক্ষিদে পেয়েছে।"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "হয়নি এখনো, এই যে তৈরী ক'রে দিচ্চি। খেতুর তো ক'দিন খাওয়া ছিল না, আজ বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি ক'খানা তৈরী ক'রে দিলাম।"

ব্রজসুন্দরী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিলেন, "তা স্বচ্ছন্দে দাওনা, সে জন্যে আর কে কি বলচে বল। তবে ছেলেটা ক্ষিদেয় কাঁদছে, তাই বলতে এসেছিলাম।"

দুর্গাদেবী একটু চড়া গলায় বলিলেন, "এর আবার বলাবলি কি ছোট বৌ, বলতে এসেছিস্ ব'লে গেলি। আমিও তৈরী ক'রে দিচ্চি।"

ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "তা আমিই বা এমন কি বলেছি গো, যে তোমার গায়ে হিং বেজে গেল। তোমার আজ কাল এমনি হ'য়েছে যে, তোমার সঙ্গে কথাটী কইবার যো নাই।"

দুর্গাদেবী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দেখ্ ছোট বৌ, ভাল চাস্ তো সরে যা, আমার সঙ্গে তোর কথা কইতে হবে না।"

একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ব্রজসুন্দরী চলিয়া গেলেন, এবং আপনার ঘরে গিয়া ছেলেকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হতভাগা ছেলে, ক্ষিদে পেয়েছে ছাই খা। তোদের কি কেউ রাঁধুনী চাকরাণী আছে যে, আগে ভাগে খাবার তৈরী ক'রে দেবে? এত পেটের জ্বালা হয়, রাঁধুনী রাখতে বলবি।"

দুর্গাদেবী গুম হইয়া বসিয়া ময়দা মাখিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ আহার শেষ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "কি জেঠাইমা, আর খানকতক রুটী ভেজে দেবে নাকি?"

দুর্গাদেবী কোন উত্তর করিলেন না, শুধু হাতের উল্টা পিঠ দিয়া একবার চোখ মুছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিল, "ছি জেঠাইমা, তুমি কেঁদে ফেললে? কিন্তু দেখ, আমি সমস্ত রুটী উদরস্থ ক'রে হাসতে হাসতে চললাম। তুমি কিচ্ছু ভেবো না জেঠাই মা, আমার আর ওসব কথা গায়েই লাগে না।"

ক্ষেত্রনাথ হাত মুখ ধুইয়া আপনার ঘরে গেল, এবং জামা কাপড় পরিয়া দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। কিন্তু বাড়ীর দরজার কাছে পৌছিয়া বাড়ীতে ঢুকিবে কি না, কি ওজর করিয়াই বা ঢুকিবে তাহাই ভাবিয়া যখন ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন সহসা যামিনীনাথ বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

রাঁধুনীর মাহিনা

যতীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমাসের খোরাকীর টাকাটা দিলে না বৌদি ?"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "দেব। কিন্তু তার আগে আমার মাইনেটা হিসেব ক'রে দাও।"

একটু বিস্ময়ের সহিত যতীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাইনে !"

দুর্গাদেবী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কেন, আমি কি তোমাদের মিনি মাইনের রাঁধুনী না কি ?"

যতীন বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা বটে।"

রাগতভাবে দুর্গাদেবী বলিলেন, "বটে নয়, হয় আমার মাইনে হিসেব ক'রে চুকিয়ে দাও, নয় তোমরা অন্য লোকের চেষ্টা দেখ।"

"কিন্তু হিসাবটা কতদিন থেকে হবে ?"

"কতদিন থেকে কি ? যতদিন হ'তে তুমি সাবালক হ'য়েছ, চাকরী ক'চ্চো।"

"আমি তো চাকরী কচ্চি আজ এগার বছর।"

"এই এগার বছরের মাইনে আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে।"

"তারপর ?"

"তারপর তোমাদের পোষায় আমাকে মাস মাস মাইনে দিয়ে রাখবে, না পোষায় অন্য চেষ্টা দেখবে।"

"বেশ, তা হ'লে খোরাক পোষাক বাদ মাসে পাঁচ টাকা মাইনে হ'লে বছরে ধর পাঁচ বারং ষাট টাকা। এগার বছরে ছ'এগার ছ'ষট্টি, ৬৬০৲ টাকা। কেমন, এই তো ?"

দুর্গাদেবী একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, "ছ'শো ষাট টাকা, তা 'লে ক'গণ্ডা হ'লো ?"

মৃদু হাসিয়া যতীন বাবু বলিলেন, "রক্ষা কর বৌদি, ও গণ্ডার হিসেব আমার দ্বারা হবে না ; আমি এনে দেব, তুমি গণ্ডা গণ্ডা হিসেব ক'রে নিও।"

"কবে দেবে ?"

"ঘরে তো এত টাকা নাই, কাল ব্যাঙ্ক থেকে এনে দেব।"

"এর পর কিন্তু আমাকে মাস মাস মাইনে ফেলে দিতে হবে।"

"সেই ভাল, আমারও ভারী হবে না।"

দুর্গাদেবী আর কিছু না বলিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

ব্রজসুন্দরী আসিয়া বলিলেন, "দিদির অন্যায়টা একবার দেখেছ ? দোষের মধ্যে কাল বিকেলে ধীরে ক্ষিদেয় আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে, ওদিকে উনি আগে ভাগে কতকগুলো রুটী তৈরী ক'রে খেতুকে খাওয়াতে ব'সেছেন। আমার অপরাধ, গিয়ে বলেছি, দিদি, ছেলেটা ক্ষিদে ক্ষিদে কচ্চে, শীগগির দু'খানা রুটী তৈরী ক'রে দাও তো। এই আর কি, আমাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।"

মৃদু হাসিয়া যতীন বাবু বলিলেন, "থাম না, সেই জন্যেই তো মাইনে করা রাঁধুনী ক'রে রাখচি। এবার আর মুখটী নাড়বার যো থাকবে না।"

ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু মাসে পাঁচ টাকা। খাওয়া পরা তিন চার টাকায় কত রাঁধুনী পাওয়া যায়।"

যতীন বাবু বলিলেন, "পাওয়া যায়, তবে তাদের ভিতর বামুনের মেয়ে বেছে নিতে একটু কষ্ট হয়। গোপাল বাবুদের বাড়ীতে এক রাঁধুনী ছিল, শেষে প্রকাশ পেলে সে ধোপার মেয়ে, শুধু তাই নয়, দিন কতক সোণাগাছিতে ঘর ভাড়া ক'রে ছিল।"

মুখ ঘুরাইয়া ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ, সব্বাই বুঝি তাই হয়? ওরি মধ্যে একটু জানা শোনা লোক কি পাওয়া যায় না?"

যতীন বাবু বলিলেন, "তা যাবে না কেন, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তো পাওয়া যায় না। ভাল, তুমি চেষ্টায় থাক, ততদিন উনিই থাকুন না।"

ব্রজসুন্দরী ইহাতে আপত্তি করিবার আর কিছু পাইলেন না।

পরদিন যতীন বাবু আপিস হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িবার আগেই দুর্গাদেবীকে ডাকিলেন, এবং তিনি আসিলে পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। দুর্গাদেবী বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নোটের তাড়ার দিকে চাহিলেন। যতীন বাবু বলিলেন, "গুণে নাও।"

দুর্গাদেবী মুখ তুলিয়া বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "এ কত টাকা?"

যতীন বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছশো ষাট টাকা।"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "সে কিরে, এ যে এক রাশ নোট!"

"সব দশ টাকার নোট, ছ'ষট্টিখানা নোট আছে। গুণে দেখ।"

"কিন্তু এত টাকা নিয়ে আমি কি করবো?"

ক্রুদ্ধস্বরে যতীন বাবু বলিলেন, "ফেলে দেবে, আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। তুমি কি করবে আমি তার কি জানি।"

দুর্গাদেবী বিষণ্নমুখে নোটগুলা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। যতীন বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "শোন, তুমি খোরাক, মাসে পাঁচ টাকা মাইনে, বছরে দু'জোড়া কাপড় আর দু'খানা গামছা পাবে।

দশমীর দিন চার পয়সা দেওয়া হবে। এতে রাজি হও থাক, নয় তো কাল থেকে হাঁড়ী ছুঁয়ো না।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া যতীন বাবু জামার বোতাম খুলিতে লাগিলেন। দুর্গাদেবী ডাকিলেন, "ঠাকুর পো!"

যতীন বাবু নিরুত্তর। দুর্গাদেবী পুনরায় ডাকিলেন, "যতীন!"

রুষ্টস্বরে যতীন বাবু উত্তর দিলেন, "কেন?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে দুর্গাদেবী বলিলেন, "আমার অন্যায় হয়েছে, যতীন।"

যতীন বাবু মুখ ফিরাইয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "অন্যায় তোমার নয়, অন্যায় আমার। তোমার কথায় লেখাপড়া শিখেছি, তোমার হুকুমে বিয়ে ক'রেছি, তোমার চেষ্টায় সংসার পেতে ব'সেছি। কিন্তু তখন কি আমি জানতাম, তুমি এতটা স্বার্থপর!"

দুর্গাদেবী বলিলেন, "চুপ কর্ যতীন, রাগ করিস্ না।"

চীৎকারে ঘরখানাকে কাঁপাইয়া যতীন বাবু বলিলেন, "রাগ করবো না? তুমি আমাকে কি ভেবেছ বল দেখি? তুমি আজ এস গয়না বাঁধা দিয়ে খেতুর খোরাকী দিতে, আজ এস আমার কাছে মাইনের দাবী করতে। যে তোমার একটা হুকুম আমার কাছে গুরুর আজ্ঞা, সেই তুমি ভয়ে ভয়ে আসচো আমাকে একটা অনুরোধ করতে। কেন, আমাকে তুমি কি ভেবে নিয়েছ! আমি মানুষ না ভূত? না, তোমাকে এ টাকা নিতেই হবে, মাস মাইনে নিয়ে তোমাকে আমার স্ত্রীর রাঁধুনী-বৃত্তি করতেই হবে। নয় তো আমি তোমারই দিব্যি ক'রে বলচি—"

যতীন বাবু আর বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি অবসন্নভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। দুর্গা-

দেবী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, আমি টাকা নিয়ে যাচ্ছি। তুই ঠাণ্ডা হ'।"

দুর্গাদেবী নোটের তাড়া এক হাতে লইয়া, অপর হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেলেন। বাহিরে ব্রজসুন্দরী বজ্রাহতের ন্যায় নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ঘরে ঢুকিবার সাহসও তাঁহার হইল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নিরাশায় আশা

"এ সব কি হচ্চে ?"

"কোন্ সব ?"

"মনো নাকি যামিনীর মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিয়েছে ?"

একটুও বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া দেবেন্দ্র বাবু বেশ সহজ স্বরেই বলিলেন, "তাই দেওয়াই সম্ভব। আমিও ঠিক এই রকম আশা ক'রে ছিলাম।"

করুণাময়ী বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আশা করেছিলে ?"

"হাঁ, কারণ আমি জানি, মনো কোন দিনই যামিনীকে পছন্দ করে নাই।"

"তবে সেদিন মত দিলে কেন ?"

মৃদু গম্ভীর হাস্য সহকারে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সেইটাই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।"

তাঁহার মুখে হাসি দেখিয়া করুণাময়ী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এতে যামিনীকে কতটা অপদস্থ হ'তে হ'য়েছে জান ? সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা প্রকাশ পর্য্যন্ত করেছিল।"

দেবেন্দ্র বাবু স্থির স্বরে বলিলেন, "তাতে আর হ'য়েছে কি ? কখন কখন ছাদনাতলা থেকেও বর ফিরে যায়।"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া করুণাময়ী বলিলেন, "তুমি বুঝি যামিনীকেও সেই সকল শ্রেণীর বর মনে কর ?"

"করি না ব'লেই আমি ব্যস্ত হ'তে নিষেধ ক'রেছিলাম।"

"তোমার মত দীর্ঘসূত্র হ'লে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না।"

অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়াও যে করুণাময়ী কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিলেন না, এ উত্তরটা না দিয়া দেবেন্দ্র বাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। করুণাময়ী বলিলেন, "এতে কিন্তু শুধু যামিনীকে নয়, আমাদেরও সমাজে অনেকখানি অপদস্থ হ'তে হবে।"

"কারণ?"

"কারণ ঐ মাষ্টার ছোকরা। এরি মধ্যে ওর নাম নিয়ে অনেকে আন্দোলন সুরু করেছে।"

"ও বেচারীর অপরাধ?"

অতিমাত্র উত্তপ্ত কণ্ঠে করুণাময়ী বলিলেন, "অপরাধ, তোমার মেয়ে ওকে ভালবাসে।"

"ভালবাসে, তাতে এমন কি ক্ষতি হ'য়েছে?"

"ক্ষতি এই যে, ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে না। কারণ ও হিন্দু।"

"হিন্দু না হ'য়ে যদি মহারাষ্ট্রীয় অথবা খৃষ্টান হ'তো?"

"তা হ'লে তো কোন কথাই ছিল না।"

মৃদু হাসিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তা হ'লে দেখছি, তোমরা শুধু হিন্দুদেরই একঘ'রে করতে চাও।"

"হিন্দুরা পৌত্তলিক।"

"পৃথিবীতে কোন্ জাতি যে পৌত্তলিক নয়, তা তো অনেক ভেবেও স্থির বলা যায় না। যে খৃষ্টান পাদরী হিন্দুদের পৌত্তলিক ব'লে গালি দেন, তিনিও যীশুর উপাসনা করতে আদেশ করেন।"

স্বামীর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করুণাময়ী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তা হ'লে ঐ হিন্দু ছোকরার সঙ্গে মনোর বিয়ে দিতে চাও ?"

দেবেন্দ্র বাবু অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "যদি ওদের পরস্পর ভালবাসা জন্মে থাকে, তবে তাতে কোন ক্ষতি বোধ করি না।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে করুণাময়ীর চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে কিয়ৎক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু একজন হিন্দু, একজন ব্রাহ্ম, এদের মিলনটা কি সুখের হবে মনে কর ? এরা কি উভয় সমাজের দ্বারাই উৎপীড়িত হবে না ?"

দেবেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "সেটা যাদের মিল তারা আগে বোঝাপাড়া ক'রে নেবে।"

উত্তপ্তকণ্ঠে করুণাময়ী বলিলেন, "আর তুমি স্থিরভাবে ব'সে এই অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবে।"

সহাস্য স্বরে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "অন্যায়ের প্রশ্রয় জীবনে বোধ হয় দিই নাই, দিতেও পারব না।"

করুণাময়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সমাজে মুখ দেখাতে পারবে ?"

দেবেন্দ্র বাবু স্থির গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন লজ্জা বা লোকনিন্দার ভয়ে কখনো ন্যায়ের সূক্ষ্মপথ হ'তে বিচ্যুত না হই।"

রাগে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে করুণাময়ী বলিলেন, "তাই বুঝি কাল যে ছোঁড়া যামিনীকে আধমরা ক'রে ছেড়ে দিলে, তাকেই আবার হাত ধ'রে এনে আদর ক'রে ঘরে বসালে ? কিন্তু এটা জেনো,

পৃথিবীর সকল লোক যদি তোমার মত ন্যায়পরায়ণ হ'তো, তা হ'লে জগৎটা একদিনেই বোধ হয় উল্‌টে যেতো।"

সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সুখের বিষয়, তোমাদের সে আশঙ্কা আদৌ নাই।"

স্বামীর মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করুণাময়ী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। দেবেন্দ্র বাবু আরাম চৌকীতে হেলান দিয়া নিমীলিত নেত্রে বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে মনোরমা আসিয়া পাশে দাঁড়াইলে দেবেন্দ্রবাবু চক্ষু মেলিলেন। মনোরমা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই শঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিল, "আজ তোমার কি হ'য়েছে বাবা ?"

মৃদু হাসিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কিছুই না, মা।"

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু না কি, নিশ্চয়ই কিছু হ'য়েছে। না বাবা, তোমার শরীর আবার খারাব হচ্চে।"

সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "এ বয়সে শরীর দিন দিন খারাবই হ'য়ে থাকে মা, এখন যে পড়্‌তি বেলা।"

মনোরমা বলিল, "তা হোক, চল আবার দিন কতক কোথাও ঘুরে আসি।"

একটু সোজা হইয়া বসিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আবার কোথায় ঘুরতে যাব ? না বাছা, এ বয়সে আর ঘুরে বেড়ান ভাল লাগে না।"

বাপের হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া মনোরমা জোর গলায় বলিল, "খুব ভাল লাগবে, আমি বলচি লাগবে। বেশী দূর না হয়, মাস দু'য়েকের জন্য পুরীতে চল।"

কন্যার সাগ্রহ দৃষ্টির উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন,

"কিন্তু এরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর বাবাকে কতদিন ধ'রে রাখবি ?"

হাতটা ঠেলিয়া দিয়া, মুখ ফিরাইয়া লইয়া মনোরমা কৃত্রিম ক্রোধ-গম্ভীর মুখে বলিল, "যাও, তোমার সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই না। তুমি বড় দুষ্টু ছেলে হ'য়েছ।"

কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে খুব কাছে আনিয়া দেবেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কিন্তু কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়। ছেলে চিরকালই দুষ্টু হ'য়ে থাকে, আবার মা সেই দুষ্টু ছেলেকেই চিরকাল আদর ক'রে আসছে।"

মনোরমা গম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু আগে বল, যাবে ?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "যাব, কিন্তু এবার পুরী নয়, পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতনার দিকে যাবার ইচ্ছা আছে।"

"সেই ভাল বাবা" বলিয়া মনোরমা এক গাল হাসিয়া পিতার কথায় সায় দিল। অতঃপর কোথায় যাওয়া উচিত, কোন্ স্থানে দ্রষ্টব্য বিষয় অধিক আছে, অথচ সেখানকার জলবায়ু ভাল, কত দিনে যাওয়া হইবে, কে কে সঙ্গে যাইবে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল।

আলোচনা শেষে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবেন্দ্র বাবু হঠাৎ ডাকিলেন, "মনো!"

চমকিত ভাবে মনোরমা পিতার মুখের দিকে চাহিল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "একটা কথা বল্‌বি মা ?"

বিস্ময়ের স্বরে মনোরমা বলিল, "এমন কি কথা বাবা, যা তোমাকে বলব না ?"

দেবেন্দ্র বাবু প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "তা জানি, কিন্তু তবু এমন দু'একটা লুকাবার কথা থাকে যা কাউকেই বলা যায় না।"

মনোরমা স্থির স্বরে বলিল, "যা কাউকে বলা যায় না, তা তোমাকে বলা যায়।"

"আচ্ছা" বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু একটু সোজা হইয়া বসিলেন; তারপর কন্যার মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ক্ষেত্রনাথকে ভালবাসিস্?"

মনোরমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, লজ্জায় মুখখানা রাঙ্গা হইয়া আসিল। এতক্ষণে সে বুঝিল, যা কাউকে বলা যায় না, তা বাপের কাছেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় না। মনোরমা ঘাড় নীচু করিয়া উত্তর দিল, "বাবা—"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমি সেটাকে দোষ ভেবে জিজ্ঞাসা কচ্চি না, শুধু একটা আগ্রহের বশেই জানতে চাইচি।"

ঈষৎ শঙ্কিতস্বরে মনোরমা বলিল, "কিন্তু তাতে কি আমার দোষ হ'য়েছে বাবা?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "দোষ গুণের বিচারক নিজের বিবেক, আমি নই। আর বাস্তবিকই ভালবাসাটা যখন জন্মে, তখন এত দোষ গুণ, হিতাহিত, শুভাশুভ বিচার ক'রে না।"

পিতার নিকট সহানুভূতি পাইয়া মনোরমা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেবেন্দ্র বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা—"

মনোরমা পিতার মুখের উপর উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি বিবাহের সম্ভাবনা আছে?"

মনোরমা উত্তর দিল, "না।"

এই 'না' কথাটা ঠিক যেন একটা বুকভাঙ্গা করুণ আর্ত্তনাদের মতই বাহির হইল। দেবেন্দ্র বাবু একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "একেবারে হতাশ হ'তে নাই মা। ঈশ্বর মঙ্গলময়; তাঁর মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস যেন কখনো আমাদের হৃদয়ে না আসে।"

বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভায় দেবেন্দ্র বাবুর ম্লান মুখখানা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনোরমার হতাশ-কালিমাচ্ছন্ন মুখে যেন একটু আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আশায় নৈরাশ্য

মনোরমার সর্ব্বদাই মনে হইতেছিল, সে খুব একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অন্যায়টা যে কোন্ দিক্ দিয়া—ক্ষেত্রনাথকে ভাল-বাসিয়া, অথবা যামিনীনাথকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহাই সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে যামিনীনাথের উপরেও অন্যায়টা যে খুব কঠোরভাবেই করা হইয়াছে ইহা সে বেশ বুঝিয়াছিল। মত দিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান—আশা দিয়া নিরাশ করা, ইহা নিশ্চয়ই একটা ভয়ানক অন্যায়। সে যদি প্রথমেই ইহার একটা নিষ্পত্তি করিয়া দিত, মাতার প্রশ্নের উত্তরে সোজা কথায় বলিতে পারিত যে, সে যামিনীনাথকে আদৌ পছন্দ করে না, তাহা হইলে সকল গোল চুকিয়া যাইত, অন্যায়টা ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহার মূলোচ্ছেদ হইত। কিন্তু তাহা সে বলিতে পারিল না; মনের উপর বল প্রকাশ করিতে গিয়া একটা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

কিন্তু এই সকল মানসিক দ্বন্দ্বের—এই সকল অন্যায়ের একমাত্র মূল ক্ষেত্রনাথ। অথচ এই অদ্ভুত-প্রকৃতি গ্রাম্য যুবকটি সহসা যে কিরূপে তাহার অনুরাগ আকর্ষণ করিল, তাহা মনোরমা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারে নাই। সে পাঁচটাকা বেতনের সামান্য গৃহশিক্ষকের দীন বেশ লইয়া তাহাদের বাড়ীতে ঢুকিয়াছে; বাড়ী ঢুকিয়া সে কোন দিনই মনোরমার সহিত এমন কোন ঘনিষ্ঠতা দেখায় নাই, আকারে ইঙ্গিতে এমন কোন অনুরাগের ভাব প্রকাশ করে নাই, এমন কোন মনোমুগ্ধকর

কথায় বার্ত্তায় মুগ্ধ করিয়া ফেলে নাই, যাহাতে মনোরমার চিত্তটা হঠাৎ তাহার উপর আকৃষ্ট হইতে পারে। এত দিনের মধ্যে চারি পাঁচবার ছাড়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হয় নাই, আবার কথা যাহা হইয়াছে তাহার সঙ্গে অনুরাগ বা ভালবাসার কিছুমাত্র আভাস ছিল না। কথার মধ্যে ক্ষেত্রনাথ আসিয়া হয় কোন পুস্তক চাহিয়াছে, নয় পড়ার কোন অভাব বা অসুবিধার কথা জানাইয়াছে। বড় জোর, অভাব পূরণের পর কখন বা একটু হাসিয়া ধন্যবাদ দিয়া গিয়াছে। অথচ এই সকল প্রেমালাপশূন্য তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া তাহার হৃদয় যে কিরূপে ক্ষেত্রনাথের দিকে আকৃষ্ট হইল, তাহাই ভাবিয়া সে অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইত; সময়ে সময়ে তাহার হাসি আসিত।

সে ক্ষেত্রনাথকে ভালবাসিয়াছে, অথচ তাহার সম্বন্ধে ক্ষেত্রনাথের মনোভাব কিরূপ তাহা সে আদৌ জানে না, কখন জানিবার অবসরও হয় নাই। শুধু একদিন একটু অবসর হইয়াছিল, যেদিন মনোরমা যামিনীনাথের হাত ধরিয়া ক্ষেত্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন ক্ষেত্রনাথের ভাবভঙ্গীতে মনোরমা যেন তাহার মনের কতকটা অংশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই আকস্মিক উত্তেজিত ভাব [illegible] সেই পাণ্ডুরতা, দৃষ্টির সেই তীব্রতা, বাস্তবিকই কি প্রণয়-ঈর্ষা-জনিত? বাস্তবিকই কি সে মনোরমার হৃদয়দ্বারে ভালবাসার ক্ষুধার্ত্ত অতিথি!

মনোরমা আপনার ঘরে বসিয়া এমনই কতকগুলা কথা ভাবিতেছিল। কিন্তু শেষের কথাগুলা ভাবিতেই সহসা তাহার মনের ভিতর এমনই একটা লজ্জা উপস্থিত হইল যে, সে আপনাকে ধিক্কার দিয়া একখানা বহি লইয়া বসিল।

বহি খানার দুই চারিছত্র পড়িবার পরই তাহার অক্ষরগুলা যেন চোখের কাছে ঝাপ্সা হইয়া আসিল। সে বইখানা কোলের উপর রাখিয়া, পুনরায় জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষেত্রনাথ কয়দিন এদিকে আসে নাই। সেই যে সেদিন মারামারিটা হইয়াছিল, তাহার পর আজ প্রায় আট দিন আর এদিক্ মাড়ায় নাই। মারামারিটা খুব সঙ্গতই হইয়াছিল। যামিনীনাথকে সে বেশ শিক্ষাই দিয়াছে! মনোরমা যদিও মারামারির প্রথমটা দেখে নাই, তথাপি শেষে উপস্থিত হইয়া সে যতটুকু দেখিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। উঃ, কি গায়ের জোর এই লোকটার! যামিনীনাথের মত ভারী মানুষটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নির্লজ্জ যামিনী উঠিয়া আবার পুলিশ ডাকিতে লাগিল। তখন মনোরমার এমনই হাসি আসিয়াছিল। সে কিন্তু বিদ্রূপের হাসিতে আপনার আনন্দ যামিনীনাথকে সম্পূর্ণ জানাইয়া দিয়াছে। ঠিক হইয়াছে। তারপর বাবা যখন ক্ষেত্রনাথের হাত ধরিয়া বাড়ী ঢুকিলেন, তখন এমনই ইচ্ছা হইল, সে-ই সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া যুদ্ধবিজয়ী বীরের অভ্যর্থনায় ক্ষেত্রনাথকে অভ্যর্থিত করে। যামিনীনাথকে শুধু ফেলিয়া না দিয়া যদি আরও একটু ভালরকম শিক্ষা দিতে পারিত!

সহসা মনোরমা আত্মস্থ হইয়া ভাবিল, ছি ছি, এত নীচপ্রবৃত্তি আমাতে কোথা হইতে আসিল। সে আপনার উপর রাগিয়া আপনি ভ্রূকুটী করিল।

কিন্তু ক্ষেত্র বাবু কয়দিন আসেন না কেন? লজ্জায়? কাজটা এমন কিছু অন্যায় হয় নাই যাহাতে লজ্জা হইতে পারে। আজ রবিবার, আজ বোধ হয় আসিতে পারেন।

মনোরমা উঠিয়া রাস্তার দিকের জানালার কাছে গেল, এবং সেখান

হইতে রাস্তার যতটা অংশ দেখা যায়, দেখিয়া লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল। এবার বই রাখিয়া সেলাই লইয়া বসিল।

সহসা সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মনোরমা একটু চমকিয়া উঠিল, এবং চঞ্চল দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। যামিনীনাথ ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। মনোরমা ম্লানমুখে প্রত্যভিবাদন করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। যামিনীনাথ পাশের একখানা চৌকীতে গিয়া বসিলেন।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিল, কেহ কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে যামিনীনাথ ধীর নম্রস্বরে বলিলেন, "আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি, আশা করি, সে দিনের আমার রূঢ় ব্যবহার ক্ষমা করবে।"

মনোরমাও সেলায়ের দিকে মুখ রাখিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "আমিও আমার রূঢ়তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই।"

আবার উভয়ে নীরব। কিছুক্ষণ পরে যামিনীনাথ বলিলেন, "কিন্তু আমি এমন ভরসা করতে পারি না কি, যে অতঃপর তুমি আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করবে?"

মৃদু হাস্যের সহিত মনোরমা বলিল, "তাতে বাস্তবিকই আমি আনন্দিত হব।"

এই উদারতার জন্য যামিনীনাথ তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "একটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা অবশ্য বন্ধুত্বের স্পর্দ্ধাতেই বলতে পারি।"

মনোরমা নীরবে সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিল। যামিনীনাথ গলাটাকে বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি

সাবধান ক'রে দিতে চাই যে, তোমার ভালবাসা অপাত্রে ন্যস্ত হ'য়েছে।"

তীব্র ভ্রূভঙ্গীর সহিত যামিনীনাথের মুখের উপর একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনোরমা মুখ ফিরাইয়া লইল। যামিনীনাথ কিন্তু সে দৃষ্টিপাতে নিরস্ত না হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সবিশেষ অনুসন্ধানে জেনেছি যে, ও ছোকরা তোমার ভালবাসা পাবার আদৌ যোগ্য নয়।"

মনোরমা ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি অনর্থক পরিশ্রম করেছেন।"

যামিনীনাথ বলিলেন, "অনর্থক নয়, আমার পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে। আমি জেনেছি—"

বাধা দিয়া মনোরমা তীব্র শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "আপনি দেখছি ব্যারিষ্টারি ছাড়া আরও অনেক কাজ করেন।"

যামিনীনাথ কিন্তু ইহাতে দমিলেন না; তিনি আরও একটু উৎসাহিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি ওর কলেজের বিশিষ্ট বন্ধুর মুখে শুনেছি—"

"সে বন্ধুটী সম্ভবত আপনার গুপ্তচর?"

"যেই হোক, তার মুখে শুনেছি যে, ও কিছুতেই ধর্ম্মত্যাগ করবে না।"

"ধর্ম্মত্যাগ করলে খুব সম্ভব তাঁর মহত্ত্ব কিছুমাত্র বাড়তো না। আর সে জন্য তাঁকে কেউ অনুরোধও করে না।"

"শুধু তাই নয়, তা ছাড়া দেশে তার এক প্রণয়পাত্রী আছে, তার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ পর্য্যন্ত স্থির হ'য়েছে। এগ্‌জামিন শেষ হ'লেই তার সঙ্গে বিবাহ হবে।"

মনোরমার মুখখানা যেন ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। মুহূর্ত্ত পরেই তাহা অধিকতর রক্তরাগে লাল হইয়া উঠিল। মনোরমা সেই ক্রোধরক্ত মুখখানা যামিনীনাথের বিস্মিত দৃষ্টির সমক্ষে স্থির রাখিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কে আপনাকে এই সকল অনধিকার চর্চ্চার অধিকার দিয়েছিল ?"

যামিনীনাথ ঈষৎ নিম্নস্বরে বলিলেন, "কেউ না দিলেও আমার বন্ধুত্বের যে অধিকার আছে—"

বাধা দিয়া তীব্র হইতে তীব্রতর কণ্ঠে মনোরমা ব'লল, "কিন্তু কোন গোয়েন্দাকে আমি কোন দিনই বন্ধু ব'লে স্বীকার করতে পারি না।"

যামিনীনাথের চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল ; ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে ভাব সম্বরণ করিয়া যামিনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মনোরমার দিকে চাহিয়া একটা ফাঁকা নমস্কার করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মনোরমা সেলাই ফেলিয়া অবসন্নভাবে চেয়ারের গায়ে এলাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ অবসন্নভাবে পড়িয়া থাকিয়া মনোরমা যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, তখন দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে ; দেবেনবাবু ঠিক পাঁচটার সময় চা খান। সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া মনোরমা ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল, এবং তাড়াতাড়ি চা প্রস্তুত করিয়া লইয়া পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখে ক্ষেত্রনাথকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে যেন একটু থতমত খাইয়া গেল ; পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, আমিও ভাবছিলাম, এখনো চা এলো না কেন! কিন্তু আজ ঐ টুকুতে হবে না মা, ক্ষেত্রনাথেরও বোধ হয় এক কাপ দরকার হবে।"

মনোরমা চায়ের বাটীতে চিনি দিতে দিতে বলিল, "উনি তো চা খান না।"

সহাস্যে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "একদিন খেতাম না ব'লে চিরদিনই কি খাব না? তবে থাক, আপনাকে আবার—"

মনোরমা বলিল, "আর এক কাপ চা তৈরী কত্তে আমার এমন খুব বেশী পরিশ্রম হবে না। তবে আমাদের ঘরে—"

কথাটা বলিতে গিয়া মনোরমা হঠাৎ থামিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কেন, আপনারা কি?"

দেবেন্দ্রবাবুও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওদের সব আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না ক্ষেত্রনাথ, যে আমরা মুসলমানও নই, খৃষ্টানও নই, কোন ভীল সাঁওতালদের সঙ্গেও আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরাও হিন্দুসমাজেরই একটা অঙ্গ, আমাদের আচরিত ধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম।"

মনোরমা বাটীতে চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "তবে জাতিভেদ প্রথাটার জন্য ওঁরা—"

বাধা দিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "হোটেলে খেলে যখন জাতি থাকে, তখন আপনাদের হাতে খেলে জাতি যাবে এ ভয় আমার নাই।"

আর একটা কাপ আনিয়া মনোরমা দুই কাপ চা প্রস্তুত করিয়া দিল। দেবেন্দ্র বাবু বাটীতে চুমুক দিয়া একটা আরামসূচক শব্দ করিলেন, এবং ক্ষেত্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পৃথিবীতে থাকতে হ'লে মানুষকে একটা নেশা নিয়ে থাকতে হয়। কারো মদের নেশা, কারো গাঁজার নেশা, কারো আফিমের নেশা, কারো বা ধর্ম্মকর্ম্মের বা পড়াশোনার নেশা। আমার কিন্তু এই চায়ের নেশা; সকালে বিকালে একটু চা না

খেলে আমি একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাই। আমার বোধ হয়, জগতে যত রকম উৎকৃষ্ট নেশার জিনিষ আছে, চা তাদের মধ্যে প্রধান।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কিন্তু বড় বড় ডাক্তারদের মতে চা জিনিষটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।"

সহাস্যে দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ওটা ডাক্তারদের একটা অনুমান মাত্র। এই যে আমি আজ চল্লিশ বৎসরের উপর চা খাচ্চি, এতে আমার স্বাস্থ্যের কতটুকু অপকার হ'য়েছে তা কেউ বলতে পারেন? তবে অবশ্য, বাজে খরচের হিসাবে সাধারণ দরিদ্রদিগের ভিতর চায়ের প্রচলন ক্ষতিকর বটে। তাই ব'লে আমরাও যদি এক আধ কাপ চা না খাব, তবে বাঁচব কিসের জোরে?"

দেবেন্দ্র বাবু হাসিয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রনাথ আজি তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। সে দেবেন্দ্র বাবুকে উদারহৃদয় লোক বলিয়া জানিত বটে, কিন্তু তাঁহার এতটা প্রাণখোলা হাসি একদিনও দেখে নাই, এবং তিনি যে ক্ষেত্রনাথের মত একজন সামান্য লোকের সহিত এমন অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারেন ইহা সে এই প্রথম দেখিল। দেখিয়া তাহার ভক্তিটা যেন আরও একটু বাড়িয়া গেল।

চা পান শেষ হইলে ক্ষেত্রনাথ বিদায় গ্রহণ করিল। দেবেন্দ্র বাবু কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ কৌশলে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, ছোকরা পড়াশুনা খুব ভালই কচ্চে। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় পাশ করবে।"

মনোরমা নিরুত্তরে টেবিল হইতে চায়ের সরঞ্জামগুলা সরাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আজ যামিনী এসেছিল না? দেখা হ'য়েছিল?"

মনোরমা নত মস্তকেই উত্তর দিল, "হাঁ।"

তারপর সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তোমার বেড়াতে যাওয়ার কি হ'লো বাবা?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হা হা, কথাটা মনেই ছিল না। কাল সব ঠিক ক'রে ফেলবো। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? আচ্ছা, সন্ধ্যার পর ব'সে বিবেচনা ক'রে দেখা যাবে। কেমন?"

"আচ্ছা" বলিয়া মনোরমা ঘাড় হেলাইয়া চায়ের সরঞ্জাম সহিত বাহির হইয়া গেল।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

হাঁসপাতালে

দেবেন্দ্রবাবু একখানা বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। তাহার একস্থানে লিখিত ছিল,—

বাঙ্গালী যুবকের সাহস।

মোটরের অত্যাচার।

"গত কল্য অপরাহ্ণ ৬টার সময় কলেজষ্ট্রীট ও মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একখানি ঘরের গাড়ীর ঘোড়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া আরোহী সমেত গাড়ী লইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছুটিতে থাকে। কোচম্যানের হাত হইতে রাশ পড়িয়া যাওয়ায় ঘোড়াটীকে সংযত করিবার উপায় ছিল না। গাড়ীর ভিতর দুই তিনটী বালকবালিকা সমেত দুইটী রমণী ও একজন পুরুষ আরোহী ছিলেন। রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া দ্রুতগামী উন্মত্তপ্রায় অশ্বের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছিল না। ক্রমে গাড়ীখানি মিরজাফর লেনের নিকটস্থ হইলে ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক অসমসাহস সহকারে ছুটিয়া গিয়া ধাবমান অশ্বের মুখ ধরিয়া ফেলে। পরে অন্যান্য লোক আসিয়া অশ্বটীকে শান্ত ও সংযত করে। আমরা এই বীর যুবককে, সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া ক্ষিপ্ত অশ্বের সম্মুখীন না হইলে গাড়ীখানির ও তন্মধ্যস্থ আরোহী-দিগের যে কি গতি হইত, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাহসিক কার্য্য সমাপনান্তে উক্ত যুবক যখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ফুটপাথের দিকে আসিতেছিল, তখন সহসা বিপরীত দিক্ হইতে একখানি মোটরগাড়ী আসিয়া উহার উপর পতিত হয়, এবং যুবক সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া যায়। এই ধাক্কায় যুবক পড়িয়া গিয়া দেহের নানাস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত ও অচেতন হইয়া পড়ে। রাস্তার লোকেরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়া দেয়। পুলিশ নাকি মোটর গাড়ীর নম্বর টুকিয়া লইয়াছে। দিন দিন মোটরের অত্যাচার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে পথিকদিগের পদব্রজে চলাচল ক্রমশই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে সত্বর ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি।"

পাশে মনোরমা দাঁড়াইয়াছিল। দেবেন্দ্রবাবু সংবাদটা পড়িয়া তাহাকে শুনাইলেন। শুনিয়া মনোরমা খানিকটা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, "এই লোকটী কি—"

কন্যার অনুমানটাকে আপনার অনুমানের ভিতর টানিয়া আনিয়া দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সম্ভবতঃ আমাদেরই এই ক্ষেত্রনাথ। কাল আমাদের এখান হ'তে ফেরবার সময় বোধ হয় এই কাণ্ড ঘটেছে।"

মনোরমার মুখখানার উপর দিয়া একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগের ছায়া নাচিয়া গেল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "শুধু প'ড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছে। খুব সম্ভব আঘাত তেমন গুরুতর নয়।"

দেবেন্দ্র বাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, এ আশ্বাসে কন্যার মুখভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। তখন তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমি কলেজে গিয়ে জেনে আসছি, এই যুবা কে।"

দেবেন্দ্র বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি সঙ্গে গেলে কোন দোষ আছে কি বাবা?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "দোষ কিছুই নাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রনাথ যদি অপর কোন লোক হয়। তা ছাড়া গাড়ী জুততে দেরী হবে, আমি পায়ে হেঁটেই যাব।"

মনোরমা আর কিছু বলিল না। দেবেন্দ্র বাবু বাহির হইয়া গেলেন। মনোরমা রাস্তার দিকের জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে দেবেন্দ্র বাবু ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা তখনও জানালার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু কন্যাকে ডাকিয়া তাহাকে জানাইলেন, আহত ব্যক্তি ক্ষেত্রনাথই বটে। এখনও তাহার জ্ঞান হয় নাই, তবে ডাক্তার বলিয়াছেন, ভয় নাই, শীঘ্রই জ্ঞান হইবে। সে প্রথমে সাধারণ কক্ষে ছিল; দেবেন্দ্র বাবু তাহাকে স্বতন্ত্র রুমে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

আহারান্তে মনোরমা পিতাকে সঙ্গে লইয়া মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হইল। রোগীকে তখন নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র কক্ষে আনা হইয়াছিল। তখনও তাহার চৈতন্য হয় নাই। কলেজের শুশ্রূষাকারিণী শয্যাপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দেবেন্দ্র বাবু ও মনোরমাকে দেখিয়া পরিচারিকা বাহিরে আসিল, এবং মৃদুস্বরে বলিল, "এখনো চেতনা হয় নাই, কিন্তু যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই চেতনা হইবে।"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, সে ঘরে থাকিতে পারে কি?

পরিচারিকা বলিল, "যদি কোনরূপ গোলমাল বা অস্থিরতা প্রকাশ না করা হয়, তাহা হইলে থাকিতে আপত্তি নাই।"

মনোরমা তাহাতে সম্মতি দিয়া ঘরে ঢুকিল। পরিচারিকা একটু পরে আসিব বলিয়া প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র বাবু বারান্দায় পদ-চারণা করিতে লাগিলেন।

মনোরমা ধীরে ধীরে গিয়া নিঃশব্দে ক্ষেত্রনাথের মাথার শিয়রে বসিল, এবং উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হাতের ওয়েষ্ট রিচটা ক্ষীণস্বরে টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে ক্ষেত্রনাথ যেন খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাসে তাহার সর্ব্বশরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল। আরও মিনিট দশেক পরে হাতটা নড়িল। ক্ষেত্রনাথ হাতটা তুলিয়া পাশে ফেলিল; মনোরমার হাতের উপর হাতটা পড়িল। মনোরমা তাহা সরাইল না, শুধু পলকহীন দৃষ্টিতে ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষেত্রনাথ চোখ মেলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া অতিক্ষীণ স্বরে বলিল, "কে, নিমি ?"

মনোরমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। পাশে একখানা পাখা পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া ধীরে ধীরে ক্ষেত্রনাথের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

খানিক পরে ক্ষেত্রনাথ পুনরায় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "তুই এখানেও এসেছিস্ নিমি ? আমি তোকে চাই না।"

মনোরমার হাত হইতে পাখাটা নীচে পড়িয়া গেল। পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ করিল। তখনও ক্ষেত্রনাথের হাতখানা মনোরমার একটা হাতের উপর পড়িয়াছিল। মনোরমা অতি সন্তর্পণে হাতখানাকে সরাইয়া বিছানার উপর রাখিল। এবং ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিয়া আসিল।

পরিচারিকা দেখিল, তাহার কপাল দিয়া দরদর ঘাম ঝরিতেছে। মনোরমা বারান্দায় আসিয়া একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল।

দেবেন্দ্রবাবু কন্যার কাছে আসিয়া ক্ষেত্রনাথের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মনোরমার মুখের ভাব দেখিয়া তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিচারিকা আসিয়া জানাইল, চেতনা হইয়াছে, আর কোন ভয় নাই। আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার বাবু আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।

মনোরমা উঠিয়া পিতার হাত ধরিল; বলিল, "ঘরে চল বাবা।"

দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর অসুখ বোধ হচ্চে মনো?"

মনোরমা বলিল, "এখানকার হাওয়ায় আমার যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসচে।"

দেবেন্দ্রবাবু কন্যার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন।

সম্পূর্ণ চৈতন্য হইলে ক্ষেত্রনাথ আপনাকে হাঁসপাতালে দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু ক্রমে যখন সকল ব্যাপার স্মৃতিপথে আসিল, তখন তাহার এ বিস্ময় রহিল না। তবে তাহাকে সাধারণ রোগীদিগের থাকিবার স্থানে না রাখিয়া স্বতন্ত্র কক্ষে রাখিবার ব্যবস্থা কে করিল, এই টুকুই বুঝিতে পারিল না। রাত্রিতে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আগে তাঁহাকে সাধারণ স্থানেই রাখা হইয়াছিল। পরে আজ সকালে এক ভদ্রলোক আসিয়া এখানে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।"

ক্ষেত্রনাথ সেই ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু পরিচারিকা তাহা বলিতে পারিল না। শুধু জানাইল, আজ বৈকালে সেই ভদ্রলোক তাঁহার মেয়ের সঙ্গে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মেয়েটী অনেকক্ষণ মাথার

কাছে বসিয়া বাতাস করিয়াছিল। তারপর একটু জ্ঞান সঞ্চার হইতে দেখিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।

ক্ষেত্রনাথ বুঝিতে পারিল, এই ভদ্রলোক দেবেন্দ্রনাথ এবং এই মেয়ে মনোরমা ছাড়া আর কেহই নহে। মনোরমা তাহার পাশে বসিয়া বাতাস করিয়াছিল, কথাটা মনে করিতেই ক্ষেত্রনাথ যেন শিহরিয়া উঠিল। সে মনে মনে দেবেন্দ্র বাবু ও মনোরমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল, এবং সারাদিন মনোরমার কথাটা লইয়া মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছিল; বাতাসে জানালার পর্দা মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল; একটা টিকটিকী খাদ্যের অন্বেষণে দেয়াল বাহিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ নির্জ্জন কক্ষে একা পড়িয়া পর্দার পাশ দিয়া যে একটু ক্ষীণ আলো আসিতেছিল, তাহারই দিকে চাহিয়াছিল।

দরজার পর্দা ঠেলিয়া মনোরমা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল, এবং একটু হাসিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। ক্ষেত্রনাথও একটু হাসিল। দিনের আলোটুকুও মিষ্টি হাসি হাসিয়া জানালার পাশ হইতে সরিয়া গেল।

বিছানার পাশে টুলের উপর বসিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল "এখন কেমন আছেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল,"দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কোন অসুখ জানতে পাচ্ছিনা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মনোরমা বলিল,"সে দিন কিন্তু আপনি খুব সাহসের কাজ করেছিলেন। কাগজে আপনার নাম বেরিয়ে গিয়েছে।"

বিস্ময়ের সহিত ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল,"নাম? কে নাম বললে?"

"তা জানি না। আমরা কাগজেই আপনার নাম প'ড়েছিলাম।"

একটু ভাবিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "হয়েছে, আমাদের কলেজের ফণে ছোড়া সঙ্গে ছিল, সেই তা হ'লে নাম ব'লেছে।"

মৃদু হাসিয়া মনোরমা বলিল, "নাম ব'লে সে এমন কোন দোষ করেনি, যতটা দোষ আপনি ক্ষেপা ঘোড়া ধরতে গিয়ে করেছেন।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আমি যে ইচ্ছা ক'রেই ধরেছিলাম তা নয়, কেমন একটা খেয়াল চাপলো, কেউ ধরতে পাচ্চে না, আমি ধরবো। খেয়ালের বশেই ঘোড়াটা ধরে ফেলেছিলাম।"

ঈষৎ গম্ভীরস্বরে মনোরমা বলিল, "কিন্তু এমন খেয়াল ভাল নয়। তারপর বুঝি মোটরকারখানা এসে পড়লো ?"

ক্ষেত্র। হাঁ, ঘোড়াটা ঠাণ্ডা হ'লে কোচয়ান গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল, আমিও ফিরে আসচি, এমন সময় সামনের দিক্ থেকে মটরখানা এসে একেবারে ঘাড়ে। অনেক পুণ্যের জোর, তাই ঘাড়ের উপর দিয়ে গেল না, শুধু ধাক্কা দিয়ে আছড়ে ফেলেই চলে গেল।"

মনোরমা বলিল, "বাবা ব'লেছেন, আপনি সেরে উঠলে মোটর চালকের নামে নালিশ রুজু হবে।"

ক্ষেত্রনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "নালিশ !"

"হাঁ, বাবা পুলিশের কাছ থেকে গাড়ীর নম্বর পেয়েছেন। সেই নম্বর ধ'রে লাইসেন্স আফিসে খোঁজ করলেই—"

"খোঁজ করতে হবে না। তাঁকে আমি চিনি।"

"আপনি চিনেন ?"

"তিনি আপনাদের পরিচিত বন্ধু।"

মনোরমা ক্ষেত্রনাথের মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ক্ষেত্রনাথ বলিল, "সেদিন আপনাদের বাড়ীর দরজায় তাঁর সঙ্গেই আমার

হাতাহাতি হয়। এবারে বোধ হয় তিনি সেদিনকার পরাজয়ের শোধটা নিয়ে গেলেন। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে গাড়ী থামাতে বা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারতেন।"

মনোরমা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "পারতেন ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "স্বচ্ছন্দে। আমিও ভেবেছিলাম তাই যাবেন। কিন্তু তিনি যে সেদিনকার অপমানের শোধ নেবার জন্যেই ফুটপাথের গা ঘেঁসে গাড়ী চালিয়েছেন তা আমি জানতেম না, জানলে বোধ হয় সাবধান হ'তে পারতাম।"

শিক্ষিতাভিমানী যামিনীনাথের এইরূপ নীচ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির পরিচয়ে মনোরমা লজ্জিত হইল।

পরিচারিকা আসিয়া জানাইল যে, সাতটা বাজিয়াছে; রোগী প্রায় একঘণ্টা কথা কহিয়াছে, আর বেশী কথা কহা অনুচিত।

মনোরমা উঠিয়া নমস্কার করিল। ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "একা যাবেন ?"

মনোরমা বলিল, "বাইরে গাড়ী আছে। বাবার শরীরটা আজ খারাপ বলে আসতে পারলেন না। কাল বোধ হয় তিনি আসবেন। আপনার কোন বিষয়ে কিছু অসুবিধা নাই তো ?"

অসুবিধা যে কিছুই নাই, বরং সুবিধাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছে ইহা জানাইয়া ক্ষেত্রনাথ দেবেন্দ্রবাবু ও মনোরমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। মনোরমা বাহির হইয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ পরিচারিকার উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

আগ্নেয় গিরি

মধ্যাহ্ন অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছিল। একটা ধূসর মেঘ পশ্চিম আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নটাকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। অদূরে অশ্বথ-শিরে বসিয়া একটা পাখী চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল, ফটি-ই-ক্ জল, ফটি-ই-ক্ জল। আর বৈঠকখানার সম্মুখে বকুল গাছের নীচে মাটীর বেদীর উপর বসিয়া ঘোষাল মহাশয় গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন—

"তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল্।
ওমা প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটি,
ছুটোছুটি করি ভূমণ্ডল ;
হ'য়ে অর্থ অভিলাষী আনন্দেতে ভাসি
সর্ব্বনাশি কত জানিস্ ছল।"

নিমি ধীরে ধীরে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। কিন্তু সে দিকে ঘোষাল মহাশয়ের লক্ষ্য ছিল না; তিনি আপন মনে বিহ্বল প্রাণে গাহিতে লাগিলেন—

"এনে ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জলে দুঃখানল ;
আমার বাঁচিতে সাধ নাই বাসনা সদাই
ফণী ধ'রে খাই হলাহল।
তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে—"

সহসা পশ্চাতে চাপা হাসির শব্দ শুনিয়া ঘোষাল মহাশয় ফিরিয়া চাহিলেন, এবং নিমিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ দুইটা মুছিয়া ধরা গলায় বলিলেন, "নিমাইমণি যে?"

নিমি বলিল, "তুমি তো বেশ গাইতে পার দাদা মশায়?"

ঈষৎ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "সত্যি নাকি?"

নিমি বলিল, "সত্যিই দাদা মশায়, তুমি বেশ মিষ্টি গাও।"

ঘোষাল মহাশয়ের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল; একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আর দিদি, তোর দাদা মশায়ের কি সে দিন আছে! এমন একদিন ছিল, যখন তোর দাদা মশায়ের গান শুনবার তরে দশ বিশ ক্রোশ দূর থেকে লোক ছুটে আসতো; এই বুড়ো হাঁ করলে আসরশুদ্ধ লোক তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো।"

নিমি বলিল, "কিন্তু তোমাকে এক দিনও তো গান গাইতে শুনি নাই দাদা মশায়?"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "গান আর কোথা হ'তে শুনবি দিদি! যে দিন ভবা ছোঁড়াকে নিজের হাতে চিতেয় শুইয়ে ছিলাম, সেই দিন হ'তে গান ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর গান গাই না, গান শুনি।"

"কার গান শোন?"

"এই তোদের পাঁচ জনের।"

গালের উপর হাত রাখিয়া নিমি বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "কৎ ঃথা দাদা মশায়, আমরা গান গাই?"

সহাস্যে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "গান সবাই গায় দিদি। শুধু

সা রে গা মার সঙ্গে মিলিয়ে গাইলেই যে গান হয় তা নয়, গান অনেক রকমের আছে। সংসার জুড়ে সুখ দুঃখের, হাসি কান্নার গান দিন রাত চলেছে। সে গান কেউ মুখ ফুটে গায়, কারো গান শুধু মনে মনেই চলতে থাকে। তবে সে গান সকলে শুনতে পায় না, যার শোনবার মত কাণ আছে, সে-ই শুধু শুনতে পায়।”

নিমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু অবাক্ হইয়া দাদা মশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, “সংসারের চারদিকেই গান নিমাই মণি, গান ছাড়া সংসারে আর কিছুই নাই। ওই যে মেঘটা উঠেছে, ওর ভিতরেও গান আছে, সুর আছে, তাল লয় সকলই আছে। ঐ যে পাখীটা ডাকছে ওটাও গান, ওর ভিতর থেকেও বেহাগের করুণ রাগিণী শোনা যাচ্ছে। এই যে তুই ভাবছিস্, এটা শুধু ভাবনা নয়, গান ; এ গানেরও সুর আছে ; এর সুর এখন হয় তো টোড়া। আবার যখন ভাববি “সখি শ্যাম না এল”, তখন হবে বেহাগ।”

নিমি বলিল, “আর এই যে তুমি পাগলের মত ব’কতে সুরু ক’রেছ, এর সুর বোধ হয় ভীমরথী।”

ঘোষাল মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। নিমিও হাসিল। হাসি থামিলে ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর কি মনে ক’রে নিমাই মণি ?”

নিমি বলিল, “মা একবার তোমায় ডেকেছেন।”

“আমাকে ?”

“হাঁ, তোমাকে।”

“কেন, তোর সঙ্গে বিয়ে দেবেন বুঝি ?”

স্বরটাকে গম্ভীর করিয়া নিমি বলিল, "বিয়ে আবার ক'বার হবে দাদা মশায় ?"

সপ্রতিভভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বটে বটে,তবে বুঝি জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ ?"

সহাস্যে নিমি বলিল, "তা হতে পারে। কিন্তু ঘরে খেয়ে যাবে।"

ঘোষাল মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; নিমিও দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সহসা হাস্যবেগ সংবরণ করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "খেতা যে খুব লম্বা একখানা চিঠী লিখেছে।"

কথাটা বলিতেই ঘোষাল মহাশয়ের হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। অপরাহ্নের শেষ আলোটুকু নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া ক্রম-বর্দ্ধমান মেঘখানা আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িল। আকাশের সে ম্লানতার ছায়া নিমির মুখেও যেন একটু বিষাদের রেখাপাত করিল। তাহার বিষাদ-মলিন মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘোষাল মহাশয় রুক্ষ গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সে মনে করেছে কি জানিস্ নিমি, বুড়ো রামতারণ ঘোষাল তার বাবার কেনা গোলাম। বাবু যা হুকুম করবেন আমি তাই তামিল কত্তে বাধ্য।"

ঘোষাল মহাশয় একটু গম্ভীর হাসি হাসিলেন। সে হাসিটুকুর অর্থ এই যে, আমি তাতে আদৌ বাধ্য নই। নিমি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া শুধু সেই হাসিটী দেখিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি বাধ্য ? আমি যার বাধ্য হব, যার হুকুম মত চলবো. তার মাথায় ঝাঁটা মারি। কেন, সে কি আমার অন্নদাতা, না আমার গুরু-ঠাকুর, ইহকাল পরকালের উদ্ধারকর্ত্তা ? সে বেহ্ম হোক, খিরিষ্টান হোক, চুলোয় যাক্, আমার তাতে কি ?"

মৃদু হাসিয়া নিমি বলিল, "কিছুই না দাদামশায়, কেবল তোমার একটু রাগ হয়।"

প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া ঘোষাল মহাশয় দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "রাগ? একটুও রাগ হয় না নিমি। সে নিমকহারামের উপর রাগ কত্তেও ঘৃণা হয়। আমি শুধু তাকে এইটুকু বোঝাতে চাই, যে গাছটার মাথার উপর দিয়ে আশ্বিনে ঝড় চলে গিয়েছে, এই একটু উত্তুরে বাতাসে তার একটা ডালও কাঁপবে না।"

ব্যাপারটা কি, নিমি ভাল বুঝিতে পারিল না। সুতরাং একটু কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠীতে কি লিখেছে দাদামশায়?"

নিতান্ত অবজ্ঞার স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কি আর লিখবে! ছাই মাথামুণ্ড কত কি লিখেছে। (হাত দুইটা বিস্তৃত করিয়া) এই এত বড় লম্বা চিঠী, তার বারো আনা ভাগই সেই বেহ্ম মেয়েটার রূপ গুণের প্রশংসায় ভরা। অর্থাৎ—অর্থাৎ বুঝেছিস্ কি না।"

নত বিবর্ণমুখে নিমি বলিল, "তা সে স্বচ্ছন্দে তাকে বিয়ে করুক না, তাতে আমাদের কি?"

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কিছুই না। তবে—আচ্ছা, তুই যা, আমি এক সময় মার সঙ্গে দেখা করবো।"

নিমি প্রস্থানোদ্যত হইল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আর মাকে বলিস, আমিও নিশ্চিন্ত নাই, চেষ্টা চরিত্র দেখছি। ক্ষেত্রনাথ বাবু ছাড়া দেশে যে আর সুপাত্র মিলবে না এমন তো কোন কথা নাই। তবে—আচ্ছা, তুই যা।"

নিমি ধীরে ধীরে প্রস্থানের উপক্রম করিল। দুই পদ না যাইতেই ঘোষাল মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর শোন্, মনে ক'রে-

ছিলাম, আসচে মাঘ ফাল্গুন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবো। কিন্তু না, এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই যেমন ক'রে হয় কাজ শেষ কত্তে হবে। বুঝলি ?"

নিমি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিরুত্তরে ঘাড় নাড়িল। ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এই কাজই বোধ হয় আমার শেষ কাজ। তারপর ঠিক ক'রেছি, দামোদরের সেবা, আর বিষয় আশয়ের একটা বন্দোবস্ত ক'বে কাশীবাসী হ'ব। আর কেন নিমি, দিন তো ফুরিয়ে এল !"

শেষের এই একটা কথাতেই বৃদ্ধের হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ বেদনাটা যেন ছবির মত নিমির চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। নিমি সজল দৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় গাঢ়স্বরে বলিলেন, "বিষয় আশয়েরই বা এমন কি বন্দোবস্ত! ভোগ করবার তো কেউ নাই। অনেক কষ্টের বিষয়; এর এক একটা পয়সার জন্য আমার এক এক ফোঁটা রক্ত জল হ'য়ে গিয়েছে। তা যাক্, পরকালটা তো দেখতে হবে। বিষয় কোন একটা সৎকার্য্যে দিয়ে যাব। তাই বা কেন, সব বেচে কিনে দু'চার হাজার ভিখিরী ফকির ডেকে নিজের হাতে বিলিয়ে দেব। কেমন, সেই ভাল না নিমাইমণি ?"

উত্তরের প্রত্যাশায় ঘোষাল মহাশয় নিমির মুখের দিকে চাহিলেন। নিমির কিন্তু তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না; সে তখন বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে বৃদ্ধের অন্তরটাকে ঠিক আগ্নেয় গিরির জ্বালাবাষ্পময় অন্তর প্রদেশের ন্যায় দেখিতেছিল। তাহার তুলনায় বৃদ্ধের এই বাহ্য উগ্রতাটুকু যে কিছুই নয়, তাঁহার বুকের ভিতর যে রাবণের চিতা দিনরাত জ্বলিতেছে, যাহার আগুনে তাঁহার বুকের হাড় পাঁজরাগুলা পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, তাহারই এক একটু স্ফুলিঙ্গ বাহিরে এই ক্রোধ বা উগ্রতার আকারে নিঃসৃত হইতেছে মাত্র। বৃদ্ধের যাতনার গভীরতা হৃদয়ঙ্গম

করিয়া সহানুভূতিতে নিমির প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল; উদ্গত অশ্রুরাশি কণ্ঠা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়া তাহার গলাটা যেন চাপিয়া ধরিল। সুতরাং নিমি শুধু ঘাড় নাড়িয়াই দাদামশায়ের কথায় সায় দিল। ঘোষাল মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, মেঘমলিন আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যা হ'য়ে এল নিমি, তুই এখন ঘরে যা।"

নিমিও বুড়ার কাছ হইতে পলাইতে পারিলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। সে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিল। অল্প দূরে গিয়াই শুনিতে পাইল দাদামশায় পুনরায় অনুচ্চস্বরে গান ধরিয়াছেন,—

"এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নি মা তোর মনের মত।
অকৃতী সন্তানে মাগো যন্ত্রণা আর দিবি কত?
ভুলিয়ে ভবে এনেছিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি মা, দুর্গা ব'লে ডাকবো কত।"

দিনের আলোটুকু তখন নিবিয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় আকাশ পৃথিবী ঢাকিয়া গিয়াছে।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

খেতুর চিঠী

সেইদিন সকালে ক্ষেত্রনাথের একখানা খুব বড় চিঠি অসিয়াছিল। চিঠীখানার প্রথমে ক্ষেত্রনাথ মটরের ধাক্কা খাইয়া কিরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর হাঁসপাতালে একদিন পরে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হয়, দেবেন্দ্র বাবু সেখানে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, ১৪ দিন পরে সে হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়াছে, এই সব কথা লেখা ছিল। পড়িতে পড়িতে ঘোষাল মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন, দেবেন্দ্র বাবুর মঙ্গল কামনা করিলেন, ক্ষেত্রনাথ সুস্থ হওয়ায় মনে মনে দামোদরের পদে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তিনি পত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

"দাদামশায়, তুমি গোঁড়া হিন্দু, সুতরাং ব্রাহ্মদের নাম শুনেই হয় তো রাগে জলে উঠবে। আমারও আগে ঠিক ঐ রকমই হ'তো। কিন্তু এখন তাদের সঙ্গে মিশে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। তুমিও যদি তাদের দেখ, তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর, তবে আমি দিব্য ক'রে বলতে পারি, তোমারও ভুল ভাঙ্গবে, তুমিও তাদের ভক্তি না ক'রে থাকতে পারবে না। এদের ভিতর যে নিষ্ঠা, যে পবিত্রতা, যে উদারতা দেখা যায়, তা আমাদের হিন্দুসমাজে খুঁজে পাওয়া দায়। সকলের কথা বলতে পারি না, তবে আমি যাদের সঙ্গে মিশেছি, তাদের ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি। দেবেন বাবুর মত লোক আমি

আর দেখি নাই, আমার তো তাঁকে দেবতার মত ভক্তি কত্তে ইচ্ছা হয়।

"তার পর এদের মেয়েরা। শিক্ষায় মেয়েমানুষের প্রাণ কত উঁচু, কত সুন্দর হয়, স্নেহময়ী করুণাময়ী রমণী কেমন অযাচিত ভাবে তাঁর স্নেহ যত্ন করুণা বিলিয়ে সংসারটাকে মধুময় করতে পারে, এক মনোরমাই তার আদর্শ। আমাদের ঘরের মেয়েরা স্নেহ ভক্তি ভালবাসার কি তুচ্ছ বড়াই করে, মনোরমার মত মেয়ের কাছে তারা দাঁড়াতেও পারে না। এমন প্রাণভরা সহানুভূতি, এমন কুণ্ঠাশূন্য সেবা যত্ন, এমন বুকভরা ভালবাসা কি আমাদের মেয়েদের ভিতর আছে? তারা ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে জানে না, খোঁচা দিয়ে ব্যথা আরও বাড়িয়ে দেয়; রোগে শুশ্রূষা করতে পারে না, অস্থিরতা দেখিয়ে রোগ বাড়িয়ে দিতে পারে; ক্রোধে শান্তি দিতে জানে না, কথার রুক্ষতায় ক্রোধের মাত্রা দ্বিগুণ করে দেয়। আর এরা? আমার তো রোগশয্যায় শুয়ে মনোরমাকে দেবী ব'লে মনে হ'য়েছিল; এখনো তাই হয়। এদের মুখে ঘোমটা নাই বটে, কিন্তু পবিত্রতা আছে, শান্তি আছে। আর আমাদের ঘোমটা-ঢাকা মেয়েগুলার মুখে শুধু অশান্তি আর কুটিলতা, পরচর্চ্চা আর কলহ। শিক্ষা না পেলে মেয়েমানুষগুলা যেন জানোয়ার থাকে।

"আমার মনে হয়, এদের মত স্ত্রী নিয়ে যদি সংসার পাতা যায়, তবে সে সংসার কি সুখের হয়। তাতে জাত যায় বটে, কিন্তু প্রাণে শান্তি আসে।

"আচ্ছা দাদামশায়, ব্রাহ্মধর্ম্মটা কি ধর্ম্ম নয়? ধর্ম্ম জিনিষটা কি? তেত্রিশকোটি দেবতা, মায় ইট পাটকেল নিয়ে নাড়া চাড়াই ধর্ম্ম, আর সেই তেত্রিশকোটি দেবতার পরে যে দেবতা, যেখানে দেবতারও অবসান,

সেই দেবতার উপাসনা কি অধর্ম্ম ? কিন্তু এইটাই তো আমাদের ধর্ম্মের মূল। বেদ বেদান্ত দর্শন যা বলছে, তা তো এই—সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম। তবে মূলের সঙ্গে শাখা প্রশাখার এত ছাড়াছাড়ি ভাব কেন ? মূল ছাড়লে শাখাপ্রশাখা দাঁড়াবে কোথায় ?

"কথাগুলা ভেবে এখনো ঠিক কিছু কত্তে পারি নাই, দিনরাত ভাবছি। কিন্তু মোটের উপর আমার তো ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল ব'লেই মনে হয়। যে ধর্ম্মে দেবেনবাবুর মত উদার প্রকৃতির লোক এবং মনোরমার মত উচ্চপ্রাণা রমণী দেখা যায়, সে ধর্ম্মের কাছে আমি মাথা না নুইয়ে থাকতে পারি না। আমার ধারণা, বিয়ে ক'রে সংসারধর্ম্ম কত্তে হ'লে এই রকম একজন সঙ্গিনী নিয়েই তার সূত্রপাত করা দরকার। নয় তো বিয়ে একটা বিড়ম্বনা মাত্র হ'য়ে পড়ে। আমার ইচ্ছা, এ বিড়ম্বনা ভোগ হ'তে আমি দূরে থাকব।"

চিঠি পড়িতে পড়িতে ঘোষালমহাশয়ের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

রমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠী বাবা ? খেতা লিখেছে ?"

ঘোষালমহাশয় উত্তর দিলেন না, শুধু একবার বধূর দিকে গম্ভীর দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র। শ্বশুরের মুখের ভাব দেখিয়া রমার ভয় হইল; সে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছে বাবা ? ভাল আছে তো ?"

ঘোষালমহাশয় গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

রমা আর কিছু বলিতে পারিল না; শুধু শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টিতে শ্বশুরের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে চহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে ঘোষালমহাশয় মুখ তুলিয়া বলিলেন, "শোন।"

ঘোষালমহাশয় চিঠীখানা আদ্যন্ত পড়িয়া শুনাইলেন। চিঠী শুনিয়া রমার মুখও গম্ভীর হইয়া আসিল। পাঠ শেষ করিয়া ঘোষালমহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং চিঠীখানাকে ভাঁজ করিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে খামের ভিতর পুরিতে লাগিলেন। রমা উদ্বেগব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে বাবা?"

আহতব্যাঘ্র যেন সহসা গর্জ্জিয়া উঠিল; ঘোষালমহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কিসের কি হবে বল তো? আমাকে তোমরা কি কত্তে বল? এক গাছা দড়ি নিয়ে এস বৌমা, গলায় জড়িয়ে মরি। উঃ, দামোদর, এ বয়সে এত যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না প্রভু!"

ঘোষালমহাশয় রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অস্থিরপদে বাটীর বাহিরে চলিয়া গেলেন। রমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘণ্টা খানেক পরে ঘোষাল মহাশয় বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিলেন, "বৌমা!"

রমা তখন স্নান করিয়া আসিয়া উনান ধরাইতেছিল। কিন্তু উনান-টাকে আজ যেন ভূতে পাইয়াছিল। রমা বাছিয়া বাছিয়া যত শুকনা কাঠ ঘুঁটে দিয়া ধরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, উনানটা ততই একবার ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া, যেন একটু উপহাসের হাসি হাসিয়াই আবার নিবিয়া যাইতেছিল। রমা ফুঁ দিতেছিল, প্রতিদানে উনানটা শুধু পুঞ্জীভূত ধূম [illegible]রণ করিয়া তাহার চক্ষুপীড়া উৎপাদন করিতেছিল। রমা একবার [illegible] ফুঁ দিতেছিল, এবং পরক্ষণেই পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উনানের, কাঠ ঘুঁটের, এবং পরিশেষে নিজের পর্য্যন্ত মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিতেছিল। এমন সময় শ্বশুর আসিয়া ডাকিলেন, "বৌমা!"

বৃদ্ধের স্বরে আর সে উগ্রতা ছিল না, গাম্ভীর্য্য ছিল না; কোমলতা

ও স্নেহে স্বরটা ভরা ছিল। রমা রন্ধনশালার দরজায় আসিয়া ধরা গলায় উত্তর দিল, "কেন বাবা ?"

বধূর আরক্ত মুখ ও ধূমবিবর্ণ সবাষ্প চোখ দুইটা লক্ষ্য করিয়া ঘোষাল মহাশয় ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কাঁদছিলে বৌমা ?"

সহাস্যে রমা উত্তর দিল, "না বাবা, কাঁদব কেন ?"

রান্নাঘরের দাবার খুঁটীটা ধরিয়া বৃদ্ধ একটু অনুতাপের স্বরে বলিলেন, "দেখ বৌমা, বুড়ো হ'য়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। তাই সময়ে সময়ে মনে হয়, আমি বুড়ো, আমি শোক তাপ পেয়েছি, সুতরাং জগৎ শুদ্ধ লোকের কাছে আমিই শুধু করুণা বা স্নেহযত্ন পাবার অধিকারী। কিন্তু আমি ছাড়া জগতে আরো অনেকে যে শোকতাপ পেয়েছে, আরো যে অনেক দুঃখী আছে, তাদেরও যে এগুলা পাওয়া দরকার, রাগ হ'লেই তা ভুলে যাই বৌমা।"

রমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "রাগ চণ্ডাল; বুড়ো হ'লাম, যাবার সময় হ'য়ে এসেছে, কিন্তু এখনো রাগ চণ্ডালকে দমন কত্তে পারলাম না। কাজ কিছুই হ'লো না। বৌমা, কাজ কিছুই হ'লো না। শুধু বৃথা অভিমান, আর কথায় কথায় রাগ, এই দু'টো নিয়ে এসেছি, আর যাবার সময় নিয়ে যাব লোকের ব্যথিত প্রাণের কাতর দীর্ঘশ্বাস। ছি ছি, কোন কাজই হ'লো না।"

ঘোষাল মহাশয় থপ্ করিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং বধূর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথায় রাগ ক'রেছ বৌমা ?"

রমা উত্তর দিল, "না বাবা।"

"সত্যি রাগ কর নি ?"

"সত্যিই বলছি বাবা।"

প্রীতির মৃদু হাসি হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ভগবতীর অংশ কিনা, শক্তি কত! বড় বড় বাজ বুক পেতে নিতে পারে। আর পুরুষ মানুষ—ঝাঁটা মার পুরুষ মানুষের মুখে! একটু ঘা খেলেই লাফিয়ে উঠে।"

তারপর বধূর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু মনে হয় বৌমা, আমি রাগের মাথায় তোমাকে কত কথাই বলি, তাতে তোমার কতই না কষ্ট হয়।"

রমা বলিল, "তুমি আমাকে এমন কিই বা বল বাবা, আর আমি ছাড়া বলবারই বা কে আছে? আজ তুমি কত লোককে কত কথা বলবে, ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী, কত লোকের উপর হুকুম চালাবে। কিন্তু ভগবান্ তো সে সবই ঘুচিয়ে দিয়েছেন। কে আর আছে বাবা? একটা আমার উপরেও যদি কদাচ কখন—"

রমা আর বলিতে পারিল না; শোকে দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া উনানটা তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; রমা উনানে হাড়ী চাপাইতে গেল।

একটু বসিয়া থাকিয়া ঘোষাল মহাশয় ডাকিলেন, "আচ্ছা বৌমা।"

রমা ডালের হাঁড়ীটা উনানে চাপাইয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিয়া বাহিরে আসিল। ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বৌমা, খেড়া কি সত্যিই এতটা কত্তে পারবে? তোমার কি মনে হয়?"

রমা বলিল, "আমার তো বিশ্বাস হয় না বাবা।"

ঘোষাল মহাশয় স্বরে একটু জোর দিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস না হ'বারই বা কারণ কি? ধর, প্রলোভনে প'ড়ে যদিই সে কাজটা ক'রে

ফেলে, কে তাকে ধ'রে রাখবে ? সেখানে তাকে ধ'রে রাখবারই ব
আছে কে ?"

ধরিয়া রাখিবার মত কেহ যে নাই ইহা রমাও জানিত। সুতরা
শ্বশুরের কথার কোন উত্তর সে দিতে পারিল না। উত্তরের প্রত্যাশা
বধূর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন
"এক কাজ করলে হয় না বৌমা ?"

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ ?"

ঘোষাল মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমি একবা
কলকাতায় যাই। গিয়ে তাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে এখানে নিয়ে আসি
এখানে এনে একবার যদি বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারি, আর রাম যা
কোথায়।"

রমা কোন উত্তর দিল না। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি
বোঝালে সে বুঝবে না ?"

রমা বলিল, "যদি না বুঝে ?"

"না বুঝে, তার যা ইচ্ছা তাই করবে। আমি দায় ধর্ম্ম হ'তে খালাস।"

রমা নিরুত্তর। ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, যাব ?

রমা বলিল, "না।"

ঘোষাল মহাশয় বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বধূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন
"যাব না ?"

রমা জোর গলায় বলিল, "নাঃ। কে সে খেতা বাবা, যে তাকে
তুমি অনুরোধ উপরোধ কত্তে যাবে ! বনের শুকনো পাতা, ঝড়ে উড়ে
এসে পড়েছিল, আবার ঝড়ে উড়ে গিয়েছে। তার কাছে তুমি যাবে
মাথা হেঁট কত্তে ?"

ঘোষাল মহাশয়ের মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষণ পরেই ম্লানমুখে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কিন্তু ছোঁড়াটা অধঃপাতে যাবে বৌমা ?"

রমা বলিল, "তার অদৃষ্টে তাই থাকে, তুমি তার রোধ কত্তে পারবে ? তবে কেন মিছে অপমান হ'তে যাবে ?"

ঘোষাল মহাশয় মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "ঠিক বলেছ বৌমা, বুড়ো হ'য়ে কিসে মান, কিসে অপমান, সেগুলা পর্য্যন্ত ভুলে যাচ্চি। সত্যিই তো, আমি যাব খেতাকে অনুনয় বিনয় কত্তে ? গলায় দড়ি, গলায় দড়ি !"

ঘোষাল মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রমা বলিল, "স্নানের বেলা হ'য়েছে বাবা।"

ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া স্নান করিতে গেলেন। রমা ডালের হাঁড়ীতে ডাল ঢালিয়া দিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিল, এবং ঠাকুরের সম্মুখে মাথা কুটিতে কুটিতে আকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বৃদ্ধের সব কেড়ে নিয়েছ ঠাকুর, কিন্তু এই শেষ অবলম্বনটুকু কেড়ে নিয়ে তার মরণের পথে আর কাঁটা ছড়িয়ে দিও না।"

ঘোষাল মহাশয় স্নানান্তে পূজা শেষ করিয়া আহারে বসিলে রমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর এক কাজ করলে হয় না বাবা, আমার খুব ব্যারাম ব'লে একখানা চিঠী দিলে হয় না ?"

ঘোষাল মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

"আমার ব্যারাম শুনলে সে কখনই না এসে থাকতে পারবে না।"

"কিন্তু এসে যখন দেখবে, খবরটা মিছে ?"

"তখন—তখন সে দেখা যাবে।"

"দেখা যাবে তার লম্ফ ঝম্প, আর এই বুড়ার উপর তর্জ্জন। সে তখন গর্ব্বে ফুলে উঠবে, আমাকে মিথ্যুক বলবে, আর তোমাদের সব উপরোধ অনুরোধ পায়ে ঠেলে আরও জোরে বুক ফুলিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে। তুমি পাগল হ'য়েছ বৌমা!"

রমা "উঃ ভগবান্" বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। ঘোষাল মহাশয় অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "গোড়াতেই ব'লেছিলাম বৌমা, পরের বোঝা ঘাড়ে চাপিও না। তখন তো বুড়োর কথা শুনলে না?"

রমা নীরবে বসিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মহামায়ার মায়া

দিনের শেষ আলোর উপর খানিকটা পাণ্ডুর মেঘের ছায়া পড়িলে আকাশের রংটা যেমন ঘোরাল হইয়া উঠে, গভীর বিরক্তি ও নৈরাশ্যে ঘোষাল মহাশয়ের জীবনের শেষ দিনগুলাও যেন তেমনই ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিমির মার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নিমির মা জানাইল যে, আসছে অগ্রাণে নিমির জন্মমাস; তারপর জোড়া বছর, সুতরাং আষাঢ় মাসের মধ্যেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে ভাল হয়।

ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমিও সেই চেষ্টাতেই আছি বৌমা। সুকৃতীর হাটে একটী ভাল ছেলে আছে খবর পেয়েছি; কাল গিয়ে সেটীকে দেখে আসি। সেটী না হয়, আরও অনেক ছেলে সন্ধানে আছে। একটা না একটা লেগে যাবে।"

অন্যত্র ছেলে দেখার কথা শুনিয়া নিমির মা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং ক্ষেত্রনাথের সহিত বিবাহ হইলে ক্ষতি কি ছিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘোষাল মহাশয় তখন ক্ষেত্রনাথের উপর রাগিয়া তাহাকে কতকগুলা গালাগালি দিলেন, এবং তাহার ন্যায় নিমকহারাম হতচ্ছাড়া মন্দ ছেলে যে দুনিয়ায় আর নাই এইরূপ কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। নিমির মা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কতক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, ক্ষেত্রনাথ যতই মন্দ ছেলে হউক, যখন আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার সঙ্গেই বিবাহ হওয়া উচিত। নতুবা ধর্ম্মহানি হইতে পারে।

এ কথায় ঘোষাল মহাশয় একটু রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কত জায়গায় ছানলাতলা হ'তে যে বর ফিরে যায়?"

নিমির মা ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না। ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, আজ কাল একবার কোন্ ছার, তিন বার আশীর্ব্বাদ হইয়া যাইতেছে। নিমির মা আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

ঘোষাল মহাশয় নিমির মাকে বুঝাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু নিজের মনকে বুঝাইতে পারিলেন না। এক একবার মনে হইতে লাগিল, দোষ কিছু নাই বটে, কিন্তু খেতুর সঙ্গেই বিবাহ হওয়া উচিত।

ঘোষাল মহাশয় দুই তিন জায়গায় ছেলে দেখিয়া আসিলেন, কিন্তু বেশ মনোমত পাত্র পাইলেন না। পরের মেয়ে, যেমন তেমন ছেলে দেখিয়া দিলেও চলিতে পারে, তাহাতে কেহই কোন কথা বলিতে পারিবে না। কিন্তু ছেলে যে নিজেরই পছন্দ হয় না, যেখানে ছেলে দেখিতে যান, সেই খানেই ক্ষেত্রনাথের সহিত তাহার তুলনা করেন, এবং সে তুলনায় ছেলে বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন না হইলেও যেন কোন না কোন অংশে একটু খুঁত বাহির হইয়া পড়ে। পাত্র মনের মত হয় না।

এইরূপে পাঁচ সাত দিন এগ্রাম সেগ্রাম ঘুরিয়াও যখন মনোমত পাত্র পাওয়া গেল না, তখন ঘোষাল মহাশয়ের বিরক্তি যেন চরম সীমায় উঠিল। তিনি বধূকে আদেশ করিলেন, "আর নয় বৌমা, বুঝতে পাচ্চি, আমার দিন এগিয়ে আসচে। এখন আর আমার নিমির ভাবনা ভাবলে চলবে না। চুলোয় যাক্ নিমি; ওর মাকে শ পাঁচেক টাকা ফেলে দেব, যা হয় করবে। আমার আর এসব ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না। এখন এ সব জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়িয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে মাথা রাখবার

জন্য আমার প্রাণ ছটফট কচ্চে। তুমি এ দিককার সব গুছিয়ে নাও বৌমা, আমি জমি জায়গাগুলোর বন্দোবস্ত ক'রে ফেলি। বুঝেছ?"

রমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ঘোযাল মহাশয় বলিলেন, "সত্যিই তো, আর কেন এত ভূতের বেগার খেটে মরি? কার জন্যেই বা খাটব? যাদের জন্যে খাটা, তারা তো অনেকদিন আগে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। আমি অন্ধ, তাই সে পথ চোখে দেখি নাই। তার ফল এই। কিন্তু আর নয় বৌমা, আপন পর সবই তো দেখলাম, এখন একবার দেখতে চাই, বিশ্বেশ্বর তাঁর বিশ্বের এই একটা বোকা বুড়াকে পায়ে ঠাঁই দেন কি না।"

দুঃখের আবেগে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। রমাও দুই ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না।

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ঘোযাল মহাশয় জমি জায়গার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। বন্দোবস্তটা যে রকম করিবেন, সেইটাই ঠিক হইল না; এ বেলা যেটাকে সুবন্দোবস্ত বলিয়া মনে করেন, ওবেলা সে সঙ্কল্পটা বদলাইয়া যায়। এদিকে রমাকে তিনি প্রত্যহ তাড়া দিতে লাগিলেন; এবং রমা যে এখনও মায়ায় বদ্ধ, বিশ্বেশ্বরের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরকালের উন্নতির জন্য তাহার একটুও উৎকণ্ঠা নাই, এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া তাহাকে রীতিমত তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না।

ঘোষাল মহাশয় গ্রামে প্রচার করিয়া দিলেন, শীঘ্রই তিনি কাশীবাসী হইবেন। ইহাতে গ্রামের অনেকেই দুঃখিত হইল। কেহ কেহ তাঁহার নিকট আসিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল যে, তাঁহার এরূপ সঙ্কল্প আদৌ ভাল নয়; তিনি গরীব গৃহস্থের মা বাপ; তিনি ছাড়িয়া গেলে তাহাদের

বাঁচিয়া থাকা দায় হইবে। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু অটল, তিনি মায়ার বন্ধন একেবারে কাটিয়া ফেলিতে চাহেন; সুতরাং তাহাদের অনুনয়ে খুব কড়া জবাব দিয়া বলিলেন, "কি করবো বাপু, তোমাদের তরে পরকালটা তো নষ্ট কত্তে পারি না। আমি আর মায়ার ফাঁদে থাকছি না।"

অথচ ঘোষাল মহাশয় সকালে সন্ধ্যায় একা বৈঠকখানায় বসিয়া যখন বকুল গাছটার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তখন যেন তাঁহার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিত। প্রায় ষাট বৎসরের পরিচিত এই গ্রামখানা; এই ঘর, এই ভিটা, পথ ঘাট, গাছপালা, লোকজন, যায় কাক পক্ষিগুলা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার কতদিনের পরিচিত, সকলেই তাঁহাকে চিনে। অথচ এই সব ছাড়িয়া কোন্ একটা অজানা অচেনা জায়গায় আবার নূতন ঘর বাঁধিতে হইবে, নূতন পরিচয় করিতে হইবে। রোজ সকালে ঐ নীল আকাশের ঐ জায়গাটায় ঐ সাদা মেঘখানা ভাসিয়া বেড়ায়; ঐ বাঁশ-ঝাড়ের ভিতর দিয়া সূর্য্যের লাল আভা প্রথম ফুটিয়া উঠে, ঐ কাকটা রোজ সকালে ঠিক ওই বাঁশটার মাথায় বসিয়া কা কা করে; রামু বাগের মা রোজ এমনি সময় শাকের ঝুড়ি মাথায় লইয়া রাজাপুরের হাটে যায়। কাশীতে গেলে ইহাদের কি দেখা যাইবে?

ভাবিতে ভাবিতে ঘোষাল মহাশয়ের প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠিত; তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবা, মণ্ডলীর কি হবে?"

গম্ভীর স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "হবে আর কি বৌমা, যাকে হয় দিয়ে যাব।"

রমা চুপ করিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় একটু থামিয়া গাঢ় স্বরে

বলিলেন, "সকলের মায়া যদি ত্যাগ করা যায় বৌমা, তবে গরুটার মায়াও ত্যাগ করা যাবে।"

রমা বলিল, "আজ সকালে মঙলীর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলছিলাম, 'মঙলি, আমরা তো চলে যাচ্চি, তুই কার কাছে থাকবি, কে তোকে যত্ন আত্তি করবে?' তোমাকে বলতে কি বাবা, মঙলীর চোখ দু'টো যেন ছল ছল হ'য়ে এলো, এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।"

ঘোষাল মহাশয়েরও চোখ দুইটা যেন ছল ছল করিতে লাগিল; তিনি কিয়ৎক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "এই দেখ বৌমা, নির্ব্বোধ পশু, ওদেরও মায়া দেখ। মানুষের যে হবে তার আর বিচিত্র কি? এ মায়ার বাঁধন কাটা কি সহজ? এই জন্যই তো বলেছে—"এমি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে, যাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য নরে কি তা জানতে পারে।" অথচ মানুষ এই মায়ার হাত এড়াবার জন্য ছুটাছুটী ক'রে বেড়ায়। আরে তার কি যো আছে? এ যে মহামায়ার মায়া, এই মায়ায় সংসারটা চলছে।"

রমা বলিল, "সত্যি বাবা, মঙলীর জন্যে বড্ড মায়া হয়।"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কেবল মঙলী কেন বৌমা, কার জন্যেই মায়া হয় না? এই ঘর, এই ভিটে, এই সব লোকজন —না বৌমা, এসব ছেড়ে যাওয়া বড় শক্ত।"

রমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমার তো বাবা, এ সব ছেড়ে যেতে আদৌ মন সরে না।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মন তো সরে না, কিন্তু না ছাড়লেই বা উপায় কি। চিরকালটাই কি এই গো-ভাগাড়ে প'ড়ে

থাকব? একালে তো এই হ'লো, এখন পরকালটাও তো দেখতে হবে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমা বলিল, "কিন্তু বাবা, এখানে থাকলে পরকালের উপায় হয় না?"

মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে ঘোষাল মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হবে না কেন বৌমা, মন ঠিক থাকলে সব জায়গাতেই কাজ হয়। কথায় আছে 'মন চাঙ্গা তো কেঠোয় গঙ্গা।' মন ঠিক করা চাই। তা নইলে কাশীতেই কি মুক্তি গড়াগড়ি যাচ্চে। মনটাকে বশ করা দরকার। মন ঠিক না হ'লে কাশীই যাও আর মক্কাই যাও, কোথাও কিছু হবে না। মনের ভিতর এক রাশ কামনা চেপে রেখে মুখে হরি হরি বললে আর কিছুই হয় না, শুধু একটা ভণ্ডামী করা হয় মাত্র।"

একটু থামিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পুনরায় বলিলেন, "তাই দিনরাত ভাবচি বৌমা, এখানে যা করি না করি, শেষটা তীর্থস্থানে গিয়েও কি ভণ্ডামী করবো? তার চেয়ে এইখানে বসেই যদি এক মনে এক প্রাণে দামোদরকে ডাকতে পারি,—কিন্তু তাই বা হয় কৈ? আজ এর ভাবনা, কাল ওর ভাবনা, পরশু খেতার চিঠি এল। না বৌমা, এ বয়সে এত ভাবনা আর ভাল লাগে না।"

রমা বলিল, "কিন্তু কাশী গেলেই কি এ সকল ভাবনার হাত এড়ান যাবে বাবা?"

উগ্রকণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এড়ান তো যাবে না, কিন্তু না গিয়েই বা করি কি? যন্ত্রণা যে অসহ্য হ'য়ে পড়েছে। তা নইলে আমারই কি সাধ যে, এসব ছেড়ে যাই? সাত বছরে পৈতে হ'য়েছে, ন' বছর বয়স হ'তে দামোদরের সেবা ক'রে আসছি। সেই দামোদরের

সেবা ছেড়ে যাওয়া—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না বৌমা, কত কষ্টে এসব ছেড়ে যেতে চাইছি। উঃ, ছেলে মরতে দেশত্যাগী হই নাই, কিন্তু খেতার জন্য যে আমায় শেষে—দামোদর! মুক্তি দাও দয়াময়, মুক্তি দাও।"

ঘোষাল মহাশয় দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার হাতের পাশ দিয়া দুই ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নিমি ভালবাসে না

সেদিন ঘোষাল মহাশয় খাতকদের বাড়ী বাড়' ঘুরিয়া এমন কড়া তাগাদা করিলেন যে,তেমন জোর তাগাদা কেহ কখনও শুনে নাই। তিনি কাহাকেও নালিশের ভয় দেখাইলেন,কাহারও ঘটী বাটী ঘর ভিটা বেচিয়া লইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। খাতকেরা অনুনয়বিনয় করিল,আপনাদের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া কাঁদা কাটা করিতে লাগিল; ঘোষাল মহাশয় কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না দৃঢ় প্রতিজ্ঞার স্বরে সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি আর কোন কথাই শুনিবেন না, কেহ খাইতে না পায়, মরুক বাঁচুক, তাহাতে তাঁহার কিছুই আসে যায় না পনরো দিনের মধ্যে তাঁহার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেই হইবে।

এইরূপে তাগাদা সারিয়া তিনি নিমিদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। নিমির মা তখন বাড়ীতে ছিলেন না, নিমি দাদামহাশায়কে বসিতে আসন দিল। ঘোষাল মহাশয় বসিয়া নিমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি অসুখ হ'য়েছিল নিমাই?"

নিমি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "কৈ না।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তবে তোর চেহারা এমন হ'য়েছে কেন? চোখ মুখ যেন ব'সে গিয়েছে, যেন আধখানা হ'য়ে পড়েছিস্।"

উদাসভাবে নিমি বলিল, "কি জানি।"

মৃদু হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আজকাল বুঝি বিয়ের ভাবনা ভাবিস্?"

ম্লান হাসি হাসিয়া নিমি উত্তর করিল, "দিন রাত।"

তাহার মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘোষাল মহাশয় যেন বিস্ময়ান্বিতের ন্যায় বলিলেন, "বলিস্ কি, দিন রাত ?"

নিমি বলিল, "দিন রাত—আহারে নিদ্রায় শয়নে স্বপনে।"

"তোর বিরহ হ'য়েছে নিমি।"

"খু-উ-ব।"

"কিন্তু বিরহের পর কি জানিস্ ?"

"সেইটাই জানতে বাকী আছে।"

"বাকী আর থাকবে না। তারপর—"

বলিয়া ঘোষালমহাশয় সুর করিয়া গাহিলেন,—

"হাসিয়া হাসিয়া বঁধূয়া আসিয়া দাঁড়াবে তমালতলে ;
ঢলিয়া ঢলিয়া আবেশে গলিয়া পড়িবি বঁধুর গলে।"

নিমি বলিল, "রক্ষা কর দাদামশাই, গান ধরলে যে ?"

ঘোষালমহাশয় বলিলেন, "মিলন হ'লো আর গান ধরবো না।"

নিমি হাসিয়া বলিল, "মিলন হ'লো নাকি ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আর মিলনের বাকী কি ? দেখ্ নিমি, তুই আর ভাবিস্ না, খেতা শালার মাথায় মারি পয়জার, তুই আমার ঘরে চল্।"

ঘোষালমহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, নিমিও হাসিল। কিন্তু উভয়েই পরস্পর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কাহারও মুখে হাসিটা মোটেই মানাইল না।

"নিমাইমণি !"

"কেন দাদামশায়।"

"সত্যি বলবি ?"

"বলবো।"

"তুই দিন রাত খেতার কথা ভাবিস্, না ?"

নিমির মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া সগর্জ্জনে বলিল, "কে বললে ?"

হাসিয়া ঘোষালমহাশয় বলিলেন, "তোর মুখখানা, তোর ঐ জিজ্ঞাসার ভঙ্গীটা।"

নিমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল। ঘোষালমহাশয় একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু সে নিতান্ত হতভাগা, নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া। তা নইলে সে আমার নিমাইমণিকে ফেলে একটা বেহ্মজ্ঞানীর ধেড়ে মেয়েকে—"

বাধা দিয়া উত্তপ্ত স্বরে নিমি বলিল, "সে যা খুসী করুক, তার কথায় আমার দরকার কি ?"

সহাস্যে ঘোষালমহাশয় বলিলেন, "দরকার এই যে তুই তাকে ভালবাসিস্।"

নিমি মুখ তুলিয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "একটুও না। আমি তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

দুই হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নিমি দ্রুতপদে ঘরের ভিতর ঢুকিল। ঘোষাল মহাশয় মৃদু হাসিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানা আষাঢ়ের অপরাহ্নের মত ম্লান গম্ভীর হইয়া আসিল।

নিমির মা গা ধুইতে গিয়াছিলেন, সিক্তবস্ত্রে বাড়ী ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই ঘোষাল মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া ভিজা কাপড়ের আঁচলটা তাড়াতাড়ি মাথায় তুলিয়া দিলেন। ঘোষাল মহাশয় ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি তো অনেক খুঁজলাম বৌমা, কিন্তু বেশ পছন্দসই ছেলে একটাও মিললো না।"

নিমির মা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়ের খুঁটটা টিপিতে লাগিলেন। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বুড়ো মানুষ, আর ছুটাছুটী কত্তেও পারি না। তোমরা না হয় যোগাড়যন্ত্র কর, খরচ পত্র যা লাগে আমি দিচ্চি।"

নিমির মা নিরুত্তরে দণ্ডায়মান। ঘোষাল মহাশয় ধীর কোমলস্বরে বলিলেন, "কিছু মনে ক'রো না বৌমা, নেহাৎ বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, ছুটাছুটি করবার শক্তি আমার নাই।"

নিমির মা অতি মৃদুস্বরে অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বলিলেন, "আপনি যা ক'রেছেন যথেষ্ট ক'রেছেন; এর বেশী আর করবেন কি।"

গভীর আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "করবার অনেক ছিল বৌমা, কিন্তু সব নিমকহারামের দল। আমি একদিনের তরেও ভাবি নাই যে, খেতা আমায় শেষে—উঃ, তোমরা যা হয় কর বৌমা, খরচ পত্র আমার ভার।"

ঘোষাল মহাশয় সহসা এমনই ব্যস্তভাবে উঠিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন যে, নিমির মা তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, নিমি ঘরের মেঝেয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তক্তাপোষের পাশ বালিশটায় মুখ গুঁজিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে। নিমির মা বিস্মিতভাবে ডাকিলেন, "নিমি!"

নিমি চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ তুলিল। মা বলিলেন, "বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছিস্ যে? কাঁদছিলি নাকি?"

খবা গলায় জোর দিয়া নিমি বলিল, "কাঁদব কেন?"

মা বলিলেন, "কেন তা তুইই জানিস্। কাঁদিস্ না তো চোখের কোণে জল কেন?"

নিমি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হাঁ জল, তোমাকে বলেছে জল।"

গর্ গর্ করিতে করিতে নিমি প্রদীপটা লইয়া সন্ধ্যার উদ্যোগ করিতে বসিল।

নিমিদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ঘোষাল মহাশয় যখন ঘরে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথে বলরাম চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাতে বলরাম দুই চারি কথায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া জানাইয়াছিলেন, নিমির যেরূপ বয়স হইয়াছে, এবং এরূপ বয়স্কা কন্যা ঘরে রাখিয়া নিমির মা যেরূপ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, তাহাতে গ্রামের লোকে পাঁচ কথা বলাবলি করিতেছে, এবং শীঘ্রই যদি নিমির বিবাহ না হয়, তবে তাহাদের সমাজচ্যুত করিবার জল্পনাও চলিতেছে। ঘোষাল মহাশয় গ্রামের একজন মুরুব্বি, তিনি যদি নিমির মাকে বুঝাইয়া বলেন, তবেই হয়। নতুবা বলরামেরই মাথা কাটা যায়, ইত্যাদি।

বলরামের কথা শুনিয়া ঘোষাল মহাশয় কিন্তু এমনই গর্জ্জিয়া উঠিলেন যে, বলরামের বোধ হইল, তাঁহার 'মাথা কাটা যায়' এই সম্ভাবনাকে ঘোষাল মহাশয় বুঝি এখনই প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করিয়া দিবেন। ঘোষাল মহাশয় খুব কড়া কথায় তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, রামতারণ ঘোষাল বাঁচিয়া থাকিতে এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, নিমির মাকে সমাজচ্যুত করে। যে সেরূপ চেষ্টা করিবে, তাহাকে তিনি রীতিমত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না। বৃদ্ধের সক্রোধ চীৎকারে ভীত হইয়া বলরাম পলায়ন করিলেন। ঘোষাল মহাশয় বড়ই অস্থির চিত্তে ঘরে ফিরিলেন। নিদারুণ অবসাদে তাঁহার দেহ ও মন দুই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

দামোদরের আরতি দিয়া ঘোষাল মহাশয় ঘরে গিয়া শুইয়া পাড়লেন। একটু পরে রমা খাইতে ডাকিতে আসিয়া শুনিল, তাঁহার জ্বর হইয়াছে, কিছুই খাইবেন না। জ্বর শুনিয়া রমা ভয় পাইল। বিছানার কাছে গিয়া পায়ে হাত দিয়া দেখিল, পায়ের তলা আগুনের মত গরম। রমা বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে ঘোষাল মহাশয় খুব চড়া সুরে আদেশ করিলেন, "আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ ক'রে চলে যাও। আলোতে আমার চোখ জ্বালা করে।"

রমা ভয়ে ভয়ে শ্বশুরের আদেশমত কার্য্য করিল। খানিক পরে ঘোষাল মহাশয় একবার অবসাদপূর্ণ মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "বৌমা!" কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন

রাত্রিতে জ্বরের ঘোরে ঘোষাল মহাশয় স্বপ্নে দেখিলেন, যেন ক্ষেত্রনাথ এক ব্রাহ্মকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফুল বাগানে বেড়াইতেছে। ঘোষাল মহাশয় সাজি হাতে ফুল তুলিবার জন্য বাগানে ঢুকিতেছিলেন, ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া বাগানের দরো-য়ানকে হুকুম দিল, "নিকাল দেও, বুড্‌ঢাকো জল্‌দি নিকাল দেও।"

দরোয়ান গলা ধাক্কা দিল, ঘোষাল মহাশয় হুমড়ি খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলেন, এবং আহত হইয়া যাতনায় চাৎকার করিয়া উঠিলেন।

সে চাৎকার রমার কাণে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল, এবং জানালা দিয়া দেখিল, শ্বশুর ঘুমাইতেছেন, তাঁহার সুপ্তিজনিত নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইল না। সে "বাবা" "বাবা" বলিয়া দুই একবার ডাকিল, কিন্তু সাড়া না পাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নিমকহারাম

জেঠাই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আবার কি হ'লো রে খেতু ?"

গভীর উপেক্ষার সহিত ক্ষেত্রনাথ উত্তর দিল, "কি হবে আবার ?"

জেঠাইমা বলিলেন, "তবে আজকাল এত কলেজ কামাই করিস্ কেন ?"

"রোজ যেতে ভাল লাগে না।"

"ভাল না লাগলে পাশ করবি কি রকমে ?"

"নাই বা পাশ করলাম।"

দুর্গাদেবী বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নাই বা পাশ করলি ? তবে কি করবি ?"

উদাস স্বরে ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "কিছুই না।"

দুর্গাদেবী তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "কিছুই করবি না তো মিছে এখানে পড়ে আছিস্ কেন ?"

"কি করবো ?"

"দেশে চলে যা।"

"কেন, তোমাদের ভাত দিতে কষ্ট হচ্চে না কি ?"

রাগে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া দুর্গাদেবী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "হঁ। হচ্চে।"

ক্ষেত্রনাথও একটু রাগিয়া বলিল, "সে কথা স্পষ্ট বললেই হয়।"

দুর্গাদেবী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এর আবার বলাবলি কি?

একজনের ভাত খাবি, আর শুধু শুধু ঘুরে বেড়াবি, কেন ভাত রাখবার জায়গা নাই নাকি ?"

ক্ষেত্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিল, "ভাত রাখবার জায়গা আছে কি না সে তোমরা বুঝবে। আমি—আমি চলে যাচ্চি।"

দুর্গাদেবী স্থির দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "চলে যাবি ? স্বচ্ছন্দে চলে যা। সে ভয় তুই কাকে দেখাস্ রে খেতা ? আমাকে ? কেন, তুই আমার কে, তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ? তুই থাক্ বা যা, আমার তাতে কি আসে যায় বল্ দেখি ?"

উচ্ছ্বসিত অভিমানের আবেগে তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। ক্ষেত্রনাথ মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। দুর্গাদেবী রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "তুই যে চলে যাবি, তা কি আমি জানি না রে খেতা। যে একটা বুড়ো বুক দিয়ে তোকে মানুষ ক'রেছিল, তাকে এই বয়সে তুই কাঁদিয়ে এসেছিস্, যে স্বামি-পুত্র-হারা বিধবা বুকের সব স্নেহ ভালবাসা ঢেলে দিয়ে তোকেই আপনার সকল আশার, সকল স্বপ্নের একমাত্র সম্বল ক'রে রেখেছিল, এক কথায় তুই তার বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে এসেছিস্। সেই তুই যে আমাকে ছেড়ে চলে যাবি এটা কি বেশী কথা রে ! স্বচ্ছন্দে যা খেতা, কিন্তু এটা জেনে রাখিস্, সংসারে নিমক্‌হারামী বেশী দিন চলে না।"

দুর্গাদেবী আর বলিতে পারিলেন না, অভিমানের অশ্রুতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন। ক্ষেত্রনাথ নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল ; তার পর উঠিয়া নতমস্তকে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ক্ষেত্রনাথ আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বালিশের নীচে এক খানা চিঠী ছিল। সেটাকে বাহির করিল এবং বালিশের উপর উপুড় হইয়া চিঠী পড়িতে লাগিল। চিঠীতে লেখা ছিল,—

"শুভাশীর্ব্বাদভাজনেষু,

ক্ষেত্রনাথ, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি যে এত শীঘ্র নিজের ভাল মন্দ বুঝিয়া লইতে পারিয়াছ, ইহার অপেক্ষা আমাদের সুখের কথা আর কি আছে। একটা খুব ছোট পাখীর ছানাকে গাছতলা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া, মুখের খাবার খাওয়াইয়া পুষিলে পাখীটা বড় হইয়া যখন উড়িতে শিখে, তখন মনে কতই আহ্লাদ হয়। তারপর পাখীটা যদি একদিন মানুষের সঙ্গে সকল স্নেহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া বনে উড়িয়া পলায়, তবে তাহার জন্য মনে একটু কষ্ট হইলেও সে কষ্টের চেয়ে আনন্দটাই বেশী হয়। তুমিও সেই বনের পাখী; উড়িতে শিখিয়া বনে পলাইয়া গিয়াছ। ইহাতে আমার দুঃখের চেয়ে আমোদটাই খুব বেশী। তবে বৌমা মেয়ে মানুষ, তার কথা ছেড়ে দাও। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, বনের পাখীকে বনে উড়িয়া পলাইবার সুযোগ দিবার জন্যই মানুষ করা হয়।

যাহা হোক, তুমি কিন্তু আমার খুব একটা উপকার ক'রেছ, মায়ার পাশ কি রকমে কাটাতে হয়, ছেলে মানুষ হ'য়েও বুড়োকে তুমি সে শিক্ষা দিয়েছ। আমিও সঙ্কল্প করেছি, যত শীঘ্র পারি সংসারের মায়া পাশ কাটিয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে মাথা রাখব। এ ভাঙ্গা হাটে আর কেন? এত দিন যেতাম, শুধু একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এখনো যেতে পাচ্ছি না। ভুলটা কি জান, নিমিকে আশীর্ব্বাদ করা। আমি ভেবেছিলাম নিমির সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি সুখী হ'বে। কিন্তু এখানেই আমার মস্ত ভুল

হ'য়েছিল। তোমার প্রাণে যে ভালবাসা ব'লে কোন জিনিষ নাই, চোখে দেখেও তা বুঝতে পারি নাই। তোমার প্রাণে যদি ভালবাসাই থাকতো, তা হ'লে তুমি আমাদের—যাক্ সে কথা। নিমিকে যখন দামোদর সাক্ষী ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রেছি, তখন তুমি তাকে গ্রহণ না কল্লেও আমি তার একটা গতি না ক'রে কোথাও যেতে পাচ্চি না। তবে আশা আছে আষাঢ় মাসের মধ্যেই তার একটা গতি ক'রে দিয়ে নিজের পথ দেখবো। তোমাকে এত কথা জানাবার কোনই দরকার ছিল না, কিন্তু না জানিয়েও মন কিছুতেই স্থির মানলে না। মনই তো পাপ। বিশ্বনাথ! এ পাপের বোঝা কত দিনে নামিয়ে দেবে ঠাকুর!

তুমি সুখে থাক ইহাই আমাদের শেষ আশীর্ব্বাদ ও আকাঙ্ক্ষা। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরামতারণ ঘোষাল।"

পুনশ্চ—ক'দিন হ'তে আমার একটু একটু জ্বর হচ্চে। শোকে অনেক ভুগেছি, কিন্তু রোগে প্রায় ভুগি নাই। সুতরাং বুঝতে পাচ্চি, আমার দিন সংক্ষেপ; এটা জ্বর নয়, চিত্রগুপ্তের নোটিশ। এখন এই নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার আগে কি বিশ্বনাথের পায়ের তলায় গিয়ে পড়তে পারব না? জানি না অদৃষ্টে কি আছে।"

ক্ষেত্রনাথ পত্রখানা একবার দুইবার তিনবার পড়িল। পত্রে এমন কোন স্নেহ বা মমতার উচ্ছ্বাস ছিল না যাহাতে চোখে জল আসিতে পারে। তথাপি ক্ষেত্রনাথের চোখে জল আসিল। ক্ষেত্রনাথ চিঠিখানাকে আবার বালিশের নীচে রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

শুইয়াও কিন্তু ক্ষেত্রনাথ স্বস্তি পাইল না, জেঠাইমার তিরস্কারের কথাগুলা যেন চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহার কাণে বাজের

মত বাজিতে লাগিল। স্তব্ধ ঘরখানার কড়ি বরগাগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহার দিকে চাহিয়া, কালো কালো দাঁত বাহির করিয়া বলিতে লাগিল, নিমকহারাম। দেয়ালের গায়ে টিকটিকীটা টক্ টক করিয়া উঠিল; সেই টক্ টক্ শব্দের ভিতর হইতেও যেন প্রতিধ্বনি উঠিল—নিমকহারাম। জানালার পাশ দিয়া একখানা গাড়ী গড় গড় শব্দে চলিয়া গেল; ক্ষেত্রনাথ শুনিতে পাইল, সেও যেন সেই ঘড় ঘড় শব্দের ভিতর দিয়া বলিতে বলিতে গেল—নিমকহারাম, নিমকহারাম।

ক্ষেত্রনাথ আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া উঠিয়া বসিল, এবং সার্টখানা পাড়িয়া গায়ে ঝুলাইয়া চটি জুতাটা পায়ে দিয়াই বাহির হইল।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্ষেত্রনাথ যখন দেবেনবাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সে সহসা সেখানে উপস্থিত হওয়ার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বিস্ময়ান্বিত ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর বাড়ীতে ঢুকিবে কি পলাইয়া যাইবে এই চিন্তাটা মনে আসিবা-মাত্র যখন ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন উপরের জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার এই ইতস্ততঃ ভাবটুকু এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখিল, জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনোরমা মৃদু মধুর হাস্য দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিতেছে। সেই একটু মৃদু হাসিতেই ক্ষেত্রনাথের অন্তরের সকল ব্যথা, সকল গ্লানি সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল। সে মনের ভিতর একটা স্থির প্রফুল্লতা লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মনের কথা

ক্ষেত্রনাথ ঘরে ঢুকিলে মনোরমা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছিলেন ?"

ক্ষেত্রনাথও মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "ভাবছিলাম, এ সময়ে গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করবো কি না।"

মনোরমা বলিল, "আমি কিন্তু ঠিক এই সময়েই আপনার আগমন প্রত্যাশা কচ্ছিলাম।"

হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "সেটা আমার সৌভাগ্য।"

উৎফুল্ল স্বরে মনোরমা বলিল, "সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কথা নয়, আপনি আসবার আগে আমার ঠিক যেন মনে হয়, আপনি আসবেন।"

ক্ষেত্রনাথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মনোরমার সরলতামণ্ডিত হর্ষ-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল। মনোরমা অগ্রসর হইয়া একখানা চেয়ার সরাইয়া দিয়া বসিতে অনুরোধ করিলে ক্ষেত্রনাথ বসিল, এবং তাহার অনুরোধে মনোরমাও সম্মুখের চেয়ারখানা অধিকার করিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। তারপর মনোরমা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, "দিন কতক কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে না।"

চমকিতভাবে ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"আমরা যে বেড়াতে যাচ্চি।"

"কোথায় ?"

"পশ্চিমে। বোধ হয় আগ্রা দিল্লী হ'য়ে জয়পুরে যাব।"

ক্ষেত্রনাথের মুখখানা যেন একটু ম্লান হইয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন বিলম্ব হবে?"

মনোরমা বলিল, "খুব বেশী হয় তো দু'মাস।"

"কবে যাচ্চেন?"

"আসচে হপ্তায়।"

ক্ষেত্রনাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনোরমা এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া লইয়া তাহা পাকাইতে পাকাইতে বলিল, "আপনার যদি এখন পড়ার তেমন ভিড় না থাকে, তা হ'লে আপনিও দিনকতক দেশে বেড়িয়ে আসুন না।"

উদাসস্বরে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "ইচ্ছা হয় না।"

যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মনোরমা বলিল, "দেশে যেতে ইচ্ছা হয় না? আমার তো সহরের এই ইট পাথরের পাহাড়, গাড়ী ঘোড়ার ধড় ঘড়ানি আদৌ পছন্দ হয় না। দেশ বিদেশে—বিশেষ পল্লী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে খুব ইচ্ছা হয়।"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "যারা দু'বেলা রসগোল্লা খায়, তাদের মাঝে মাঝে মুড়ি খেতে সাধ হয়। কিন্তু দু'চার বার মুড়ির স্বাদ গ্রহণ করলেই বুঝতে পারে, মুড়ি আর রসগোল্লায় কত প্রভেদ।"

ঘাড় নাড়িয়া মনোরমা বলিল, "না না, আপনার এ দৃষ্টান্তটা ঠিক হ'লো না। আমার তো সহরের চেয়ে পল্লীগ্রাম খুব ভাল লাগে। বইএর পল্লীচিত্র পড়তে পড়তে মনে হয়, কেমন শান্তিময় স্থান। সরলপ্রাণ কৃষকদের সারি সারি কুটীর, মাঝে মাঝে গ্রাম্য পথ, তার দু'পাশে

সারি সারি গাছ ; সবুজ শস্যে ভরা মাঠ, তারি পাশ দিয়ে ছোট্ট একটী নদী ব'য়ে যাচ্চে। আমার তো ইচ্ছা হয়, এমনই একটী জায়গায় একখানি কুটীর বেঁধে বেশ শান্তিময় জীবন যাপন করি।"

ক্ষেত্রনাথ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মনোরমা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার হাস্যরাগরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া র'হল। একটু পরে ক্ষেত্রনাথ হাস্যবেগ সংবরণ করিয়া বলিল, "আপনি যা বললেন, তা বর্ণনা কত্তে বা ছাবতে আঁকতে বেশ সুন্দর বোধ হয়। কিন্তু উপভোগ কত্তে গেলে আদৌ সুন্দর মনে হয় না।"

বিস্ময়ের সহিত মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "তার কারণ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কারণ অনেক। অনেক জিনিষকে দূর থেকে খুব সুন্দর ব'লে বোধ হয়, কিন্তু কাছে গেলে তার সৌন্দর্য্য আদৌ দেখা যায় না। পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্যও অনেকটা সেই রকম। বর্ণনায় বা ছবিতে পল্লীচিত্র খুব সুন্দর বোধ হ'লেও কাছে গিয়ে যখন তার বন জঙ্গলে ঘেরা, ম্যালেরিয়ায় ভরা, পথশূন্য, হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত স্বরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়, তখন ভয় বা ঘৃণা ছাড়া একটুও আনন্দের উদ্রেক হয় না।"

মনোরমার উৎসাহপ্রফুল্ল মুখখানা যেন ম্লান হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আপনার জন্মভূমিকে এতটা ঘৃণা করেন?"

ক্ষেত্রনাথের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "ঘৃণা! জন্মভূমি আমার কাছে স্বর্গ, তার চেয়ে প্রিয় জিনিষ আর আছে কি না জানি না। কিন্তু যা আমার প্রিয়, তা যে সকলেরই প্রীতিকর হবে এটা আদৌ সম্ভব নয়।"

মনোরমা আর কিছু বলিল না; ক্ষেত্রনাথও নতমুখে নীরবে বসিয়া

রহিল। খানিক পরে মনোরমা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনাদের পল্লীগ্রামে খুব হিঁদুয়ানীর আড়ম্বর আছে?"

ক্ষেত্রনাথ উত্তর দিল, "শুধু আড়ম্বর নয়, প্রকৃত হিঁদুয়ানী যদি কিছু থাকে তা পল্লীগ্রামেই আছে।"

একটু ভাবিয়া মনোরমা বলিল, "সেখানে ব্রাহ্মদের বোধ হয় খুব বিদ্বেষের চোখেই দেখে?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "খুব, তারা ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান দুইই এক মনে করে।"

ঈষৎ হাসিয়া মনোরমা বলিল, "একেবারে খৃষ্টান?"

ক্ষেত্রনাথ কোন উত্তর দিল না। মনোরমা বলিল, "আচ্ছা, মনে করুন, আপনি আমাদের সঙ্গে মেলা মেশা কচ্চেন, আমাদের ঘরে চা বিস্কুট খাচ্চেন, এটা যদি জানতে পারে?"

"আমাকে সমাজচ্যুত হ'তে হবে।"

"চিরদিনের জন্য?"

"না, প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার সমাজভুক্ত হ'তে পারব।"

"আপনি যদি—যদি ব্রাহ্ম ঘরে বিয়ে করেন?"

ক্ষেত্রনাথের বুকটা খুব জোরে কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সে মুখে অসম্ভব দৃঢ়তা আনিয়া স্থির স্বরে বলিল, "তা হ'লে হিন্দুসমাজ আমাকে একেবারে ত্যাগ করবে।"

হঠাৎ কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া মনোরমা এমনই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। ক্ষেত্রনাথ তাহার এই লজ্জিত ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া মনের ভিতর যেন একটা অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "হিন্দুর ছেলে হিন্দুসমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজে, এমন কি নিজের সমাজেও নির্দিষ্ট

শ্রেণী ছাড়া অন্যত্র বিবাহ করলেই সমাজ তার সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করবে।"

মনোরমা ততক্ষণে আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু এরূপ ত্যাগের দ্বারা হিন্দুসমাজ ক্রমেই যে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে, এটা বোধ হয় আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।"

ক্ষেত্রনাথ একটু জোর গলায় বলিল, "কিন্তু এটাও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, এই ত্যাগের দ্বারাই সে আপনার স্বাতন্ত্র্য এতকাল বজায় রেখে এসেছে। আমার বিশ্বাস, যতদিন তার এই ত্যাগের শক্তি থাকবে, ততদিন তার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হবে না।"

"কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখবার চেষ্টার ভিতর দিয়ে যে একটা ক্ষয়ের ক্রিয়া তার মধ্যে চলে আসছে, সেই ক্ষয় হ'তে তো সে কিছুতেই আপনাকে বাঁচাতে পাচ্চে না।"

"এক দিকে লাভ কত্তে গেলেই অন্য দিকে একটু একটু ক্ষতি সহ্য কত্তে হয়।"

"সে যেখানে লাভের পরিমাণ বেশী। কিন্তু এখানে ক্ষতির পরিমাণটা লাভের চেয়ে অনেক বেশী।"

"অপরের দৃষ্টিতে ক্ষতির পরিমাণ বেশী বোধ হ'লেও হিন্দুসমাজ কিন্তু তার হিসাবের খাতায় লাভটাই বেশী দেখে আসছে। কেন না যে জিনিষটার জন্য সে এত ক্ষতি অকাতরে সহ্য কচ্চে, সে জিনিষটা তার কাছে বহুমূল্য। আর সেইটাই জগতের কাছে তার গৌরব ক'রে দেখাবার জিনিষ।"

বলিতে বলিতে ক্ষেত্রনাথের মুখখানা গর্ব্বে আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনোরমা তাহার সেই গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের উপর

দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে বলিল, "আপনি দেখচি হিন্দুসমাজের একজন গোঁড়া ভক্ত।"

সহসা ক্ষেত্রনাথের মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। সে ঈষৎ গাম্ভীর্য্য-পূর্ণস্বরে বলিল, "আপনার উক্তিটা সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারলে বাস্তবিকই আমি আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান কত্তাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি তা স্বীকার ক'রে নিতে পারি না।"

বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া মনোরমা বলিয়া উঠিল, "পারেন না ?"

"না।"

"কারণ ?"

"কারণ, হিন্দুধর্ম্মের উপর আমার আস্থা তেমন দৃঢ় ব'লে বোধ হয় না। প্রয়োজন হ'লে আমি এ ধর্ম্ম ত্যাগ কত্তেও পারি।"

"পারেন ?"

"হাঁ পারি, যদি-"

দৃষ্টিতে একটা গভীর আকুলতা লইয়া ক্ষেত্রনাথ মনোরমার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার মুখের এমনই কঠোর, চোখ দুইটার কোমল দৃষ্টি এতই তীব্র হইয়া আসিয়াছিল যে, ক্ষেত্রনাথ তাড়াতাড়ি মাথাটা নীচু করিয়া লইল। মনোরমাও পাশের জানালার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। উভয়েই নীরব। বর্ষণক্লান্ত পাণ্ডুর মেঘটা আকাশের পশ্চিম প্রান্তে ঝুলিয়া পড়িয়া আষাঢ়ের অপরাহ্নটাকে যেন স্তব্ধ বিষাদময় করিয়া দিয়াছিল। মনোরমা সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দক্ষিণের খোলা জানালায় ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া বেদনার গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতই উভয়ের মাঝখান দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে ক্ষেত্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সঙ্কুচিত ম্লান হাস্যের সহিত মনোরমাকে অভিবাদন করিল।

মনোরমা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেত্রনাথ নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে মনোরমাও উঠিয়া ধীরে ধীরে পিতার পাঠকক্ষে প্রবেশ করিল।

দেবেন্দ্রবাবু তখন আরাম চৌকীতে হেলান দিয়া চোখের খুব কাছে একখানা বই লইয়া পড়িতেছিলেন। মনোরমা গিয়া কাছে দাঁড়াইলে তিনি চোখের কাছ হইতে বইখানাকে একটু সরাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং তাহার মুখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন দেখিয়া যেন একটু চমকিত হইলেন। মনোরমা সরিয়া টেবিলের কাছে গেল, এবং টেবিলের উপর ছড়ান বই কাগজগুলা সাজাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হইল।

একটু পরে সে আবার পিতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা বাবা।"

দেবেন্দ্রবাবু কন্যার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মনোরমা বলিল, "আচ্ছা বাবা, শুনেছি বিলাতে অনেক মেয়ে মানুষ বিয়ে করে না, চিরকুমারী থাকে।"

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "হাঁ থাকে।"

"তারা কি করে?"

"কেউ আপনার ভরণপোষণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যাদের সঙ্গতি আছে তারা লোক-হিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করে।"

"সে কি কাজ?"

"যুদ্ধে আহত বা আর্ত্তের সেবা, হাঁসপাতালে রোগীর পরিচর্য্যা,

কোন মঠ বা আশ্রমে থেকে বিপন্নের সাহায্য করা। তা ছাড়া দরিদ্রপল্লীতে ধর্ম্মোপদেশ বা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, এই রকম অনেক কাজ আছে।”

“তাতে তাঁদের নিন্দা হয় না?”

“কিছুমাত্র না।”

“কিন্তু এদেশে বিয়ে না হ’লে মেয়ে মানুষের নিন্দা হয় কেন?”

“তার কারণ, এদেশে প্রায়ই মেয়েরা অবিবাহিতা থাকে না। কিন্তু কিছুদিন আগে কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক মেয়ে চিরকুমারী থাকতো।”

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, “থাকতো?”

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, “হাঁ, পাল্‌টী ঘর না পেলে তাদের বিবাহ হ’তো না। কাজেই চিরকুমারী থাকতো।”

মনোরমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দেবেন্দ্র বাবু প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার গম্ভীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, “আমার আশঙ্কা হচ্চে মনো, এই জিজ্ঞাসাগুলোর ভিতর দিয়ে তোর নিজের অন্তরের কতকগুলো প্রশ্নের সমাধান ক’রে নিতে চাইছিস্।”

মনোরমা নিরুত্তর। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার এ আশঙ্কা সত্য নয় কি?”

মনোরমা আর থাকিতে পারিল না, সে পিতার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল, এবং মাথাটা তাঁহার কোলের উপর রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্র বাবু তাহার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “কিন্তু আমার বোধ হয়, তোর মনের এই প্রশ্নগুলা সম্পূর্ণ অমূলক। কেন না, উচ্চশিক্ষিত বা ধনশালী না হ’লেও সচ্চরিত্র সৎসাহসসম্পন্ন ক্ষেত্রনাথকে আমি তোর অনুপযুক্ত মনে করি

না। আর এটাও আমি জানি, ক্ষেত্রনাথ তোর জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তেও দ্বিধা বোধ করবে না।"

মনোরমা মুখ তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "ছিঃ বাবা।"

বলিয়াই সে আবার পিতার কোলে মুখ লুকাইল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ভাল, যদিই সে ধর্ম্মত্যাগ না করে, তা হ'লেও তার হাতে তোকে সম্প্রদান করবার কোন বাধা নাই তো মা।"

বাপের পায়ের কাছে সোজা হইয়া বসিয়া মনোরমা বলিল, "বাধা অনেক আছে। সে হিন্দু, আমি ব্রাহ্ম।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আজকাল অনেক হিন্দুতে ব্রাহ্মে বিবাহ হচ্চে।"

মনোরমা জোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হয় হোক, কিন্তু একদিকে তুমি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা, অন্যদিকে সে হিন্দুসমাজের দ্বারা উৎপীড়িত হবে, তা কিছুতেই হবে না বাবা।"

দেবেন্দ্র বাবু বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুই কি কত্তে চাস বল্ দেখি?"

মনোরমা মৃদু হাসিল। সে বিষাদগম্ভীর হাসি দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। মনোরমা বলিল, "আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নিয়েছি। এখন কবে তুমি বেড়াতে যাবে তাই বল।"

দেবেন্দ্র বাবুর সদাপ্রফুল্ল মুখখানার উপর বিষাদের গভীর ছায়াপাত হইল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বেড়াতে যাওয়ার দিন তো আসছে সোমবার স্থির হ'য়ে আছে।"

মনোরমা বলিল, "আজ সবে বুধবার, তা হ'লে এখনো পাঁচ দিন না বাবা, কালই যাই চল।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "পাগল মেয়ে! পাঁচটা দিন বইতো নয়।"

মনোরমা পিতার হাতের আঙ্গুলগুলা নাড়িতে নাড়িতে আবদারের সুরে বলিল, "তা হোক, তুমি কাল যাবে কি না বল।"

দেবেন্দ্রবাবুর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই করুণাময়ী একখানা কার্ড লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সোণালী রঙ্গে ছাপা লতাপুষ্পচিত্রিত কার্ডখানা স্বামীর হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রবাবু পড়িয়া দেখিলেন, সেখানা যামিনীর বিবাহে নিমন্ত্রণের কার্ড। ব্যারিষ্টার আর, সি চৌধুরীর কন্যা লীলাবতী দেবীর সহিত যামিনীর বিবাহ, আগামী রবিবারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পড়িয়া দেবেন্দ্রবাবু কার্ডখানা ফিরাইয়া দিলেন। করুণাময়ী কন্যার মুখের উপর একটা ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। মনোরমা তখন কল্যই পশ্চিমযাত্রার জন্য পিতাকে চাপিয়া ধরিল। শেষে দেবেন্দ্রবাবুকে কন্যার মতেই মত দিতে হইল। পিতার সম্মতিতে মনোরমার ম্লানমুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে আপনার ঘরে চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়া আসিয়া ঘরের আলোটুকু ম্লান করিয়া দিয়াছিল। সেই ম্লান ছায়ালোকের মধ্যে দেবেন্দ্র বাবু নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। যখন চক্ষু মেলিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,— "তোমারই ইচ্ছা জয়যুক্ত হোক প্রভু!" তাঁহার বিষাদমলিন মুখের উপর আবার স্বাভাবিক প্রফুল্লতার ছায়া আসিয়া পড়িল।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মোহ ও চেতনা

সকল জিনিষেরই যেমন ভিতর ও বাহির দুইটা বিভাগ আছে, মনেরও তেমনই এই দুইটা দিক্‌ রহিয়াছে। অনেক সময় আমরা মনের ভিতরের অংশে দৃষ্টি করি না, বাহিরের অংশটা লইয়াই তাহার গতির অনুসরণ করিয়া থাকি। কিন্তু ভিতরে যে একটী সূক্ষ্ম ভাব চাপা থাকে, তাহা দেখিতে পাই না, দেখিবার চেষ্টাও করি না। তারপর সামান্য একটু আঘাতে বা তুচ্ছ একটী কথায় সেই সূক্ষ্ম ভাবটী যখন সহসা স্থূলভাবে প্রকাশ পাইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে পারি আমাদের সঙ্গে মনের কি কারচুপী খেলা চলে।

ক্ষেত্রনাথও মনের এই কারচুপীটুকু আগে ধরিতে পারে নাই। সে মোটামুটি এইটুকু জানিত যে, মনোরমার উপর তাহার একটা ভালবাসার ভাব জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহার ভিতর মনোরমাকে বিবাহ করিবার একটা সূক্ষ্ম বাসনা যে তাহার মনের এক কোণে লুকাইয়া রহিয়াছে ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মনোরমার একটা কথায়—সে ব্রাহ্মের মেয়েকে বিবাহ করিতে পারে কিনা এই একটী সামান্য প্রশ্নেই তাহার মনের ভিতরকার সেই সুপ্ত বাসনাটা যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। বাসনার সে তীব্র প্রকট মূর্ত্তি দর্শনে ক্ষেত্রনাথ স্তম্ভিত হইল।

ক্ষেত্রনাথ এখন বুঝিতে পারিল, এই সুপ্ত বাসনাটীই সময়ে সময়ে তাহার মনে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত প্রশ্ন তুলিত, ব্রাহ্ম-কন্যাকে বিবাহ করা যায় কি না? কিন্তু মন তখন জোর করিয়া উত্তর দিত—না। কিন্তু

এখন সেই মন বলিতেছে—হাঁ, দোষ কি। বাস্তবিক, দোষ কি? হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কতটুকু? আর বেদ বেদান্তের কথাই যদি সত্য হয়, যদি জীবমাত্রেই পরমাত্মার অংশ হয়, তবে কে হিন্দু কে ব্রাহ্ম, কে মুসলমান কে খৃষ্টান? সকলেই তো সেই এক পরম পুরুষের অংশ। সুতরাং ব্রাহ্মের ঘরে বিবাহ করিতে দোষ কি? দোষ থাকিলেও তাহার এমন কোন নিকট আত্মীয় নাই, যাহাদিগকে এই দোষের ফল ভোগ করিতে হইবে।

কিন্তু হিন্দুসমাজ তাহাকে ত্যাগ করিবে। যদি ত্যাগ করে, ব্রাহ্ম সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিবে। ইহাতে তাহার লাভ ভিন্ন লোকসান নাই; অশিক্ষিত অনুন্নত হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া সে শিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিবে, সঙ্কীর্ণ কূপের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বিশাল সমুদ্রের আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে; তেত্রিশ কোটি দেবতার ভীতির হাত এড়াইয়া বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য অবক্ত পরম পুরুষের পদে স্থান লাভ করিবে।

ক্ষেত্রনাথ উদ্ভ্রান্তচিত্তে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই হিন্দুসমাজের অসংখ্য ত্রুটি, অগণ্য দোষ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমাজটাকে ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিল, আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের গুণরাশি তাহার মানসনেত্র সমক্ষে স্বর্গের দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। তখন ক্ষেত্রনাথ হিন্দুসমাজের ত্যাগের অপেক্ষা না করিয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে এইরূপ একটা সঙ্কল্পকে মনের ভিতর নাড়াচাড় করিতে করিতে কতক জাগিয়া কতক ঘুমাইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

সকালে ক্ষেত্রনাথের চিন্তা-বিশুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দর্শনে দুর্গাদেবী বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি

সম্মুখে ক্ষেত্রনাথ যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; এবং অধীরভাবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা জেঠাই মা, কোন্ ধর্ম্মটা ভাল?"

জেঠাইমার বিস্মিত দৃষ্টিটা যেন আরও একটু বেশী বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল; তিনি অবাক্‌ভাবে খানিকটা তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মের আবার ভাল মন্দ কি রে?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "ভাল মন্দ আছে বই কি। এই ধর হিন্দু ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, এদের কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ।"

একটুও না ভাবিয়া দুর্গাদেবী উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মের ভাল মন্দ নাই, যার যে ধর্ম্ম তার তাই ভাল।"

ক্ষেত্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাও কি হয়? সবই যদি ভাল, তবে ধর আমি সন্ধ্যা না ক'রে যদি নমাজ পড়ি।"

মৃদু হাসিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "সে তোর বাবা পড়লে তুইও পড়তে পারতিস্। কিন্তু তুই যখন হিঁদুর ছেলে, তখন সন্ধ্যা করবি, যে মুসলমান সে নমাজ পড়বে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "ঐটীই তো হচ্চে মূল কথা। এখন নমাজ ভাল না সন্ধ্যাটা ভাল? তুমি বলচো দুইই ভাল। কিন্তু তা তো হ'তে পারে না। এর ভিতর একটা ভাল একটা মন্দ আছে, আর সেইটী জানাই হচ্চে আমার আসল কথা।"

দুর্গাদেবী মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আসল কথা যা, তা তুই এখনো ধত্তে পারিস্ না। আসল কথা হচ্চে, নমাজ আর সন্ধ্যা এদের উদ্দেশ্য কি?"

"আচ্ছা তাই, এদের উদ্দেশ্যটা কি বল।"

"উদ্দেশ্য হচ্চে তাঁকে ডাকা। তা যে যে রকমে ডাকতে পারে। কেউ রাম বলে ডাকচে, কেউ বা রহিম ব'লে ডাকচে।"

"কিন্তু কার ডাকে সাড়া দেবেন ?"

"সকলের ডাকেই সাড়া দেবেন। পরমহংসের উপদেশ পড়েছিস্ ? তাতে আছে, একটা ছেলেকে কেউ নিত্যানন্দ ব'লে ডাকে, কেউ নিতে ব'লে ডাকে, কেউ আদরের নাম পটলা ব'লে ডাকে। ছেলেটা কিন্তু সকলের ডাকেই সাড়া দেয়। ভগবানও তাই।"

"সুতরাং ধর্ম্ম সবই ভাল ?"

"হাঁ, ও তো আর কিছুই নয়, তাঁকে পাবার রাস্তা। এই ধর্ হুগলী থেকে কলকাতায় আসতে হ'লে কেউ জলপথে আসচে, কেউ হাঁটা পথে, কেউ বা রেলে আসচে। কিন্তু যে যেখান দিয়েই আসুক, সকলে সেই এক কলকাতাতেই এসে পৌঁছাবে। আমার কাছে পরমহংসের বই একখানা আছে, যতীন আমাকে প'ড়ে শোনাত। তুই সেখানা প'ড়ে দেখিস্।"

"আচ্ছা" বলিয়া ক্ষেত্রনাথ বাহির হইয়া চিন্তিতভাবে দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মনোরমার দেখা পাইল না। দেবেন্দ্র বাবু কন্যাকে লইয়া বাজারে গিয়াছেন। বৈঠকখানা ঘরে করুণাময়ী বসিয়াছিলেন; তিনি ক্ষেত্রনাথকে বসিতে বলিলেন। ক্ষেত্রনাথ একটু সঙ্কুচিত ভাবেই তাঁহার সম্মুখে বসিল।

করুণাময়ী ক্ষেত্রনাথের উপর প্রসন্ন না থাকিলেও ভদ্রতার অনুরোধে কোনরূপ বিরক্তির ভাব দেখাইলেন না, বরং বেশ শান্ত সহজভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং কথায় কথায় এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের

উপর তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, এবং এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য তাহার একটু আগ্রহও আছে। করুণাময়ী ইহাতে আনন্দিতা হইলেন। তিনি তখন হর্ষবিহ্বল চিত্তে যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইলেন, এবং সেই সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম্মের উপর এমন সব তীব্র বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে ক্ষেত্রনাথও লজ্জিত ও মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিল না। অশিক্ষিতা জেঠাইমা এক কথায় সর্ব্বধর্ম্মের উপর কতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর এই শিক্ষিতা মহিলা স্বীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে অন্য ধর্ম্মের হীনতা কি জঘন্যভাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, ইহা ক্ষেত্রনাথ যতই ভাবিল, ততই গভীর অশ্রদ্ধায় তাহার হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে কাল পর্দ্দাটা যেন ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে থাকিল।

করুণাময়ীর দীর্ঘ বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রবাবু ও মনোরমা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। করুণাময়ী বক্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়াই তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি তোমাদের একটা শুভ সংবাদ দেব, ক্ষেত্রনাথবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম ক'রে দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন।"

কথাটা শুনিয়া মনোরমা এমনই তীব্র দৃষ্টিতে ক্ষেত্রনাথের দিকে চাহিল যে, তাহাতে ক্ষেত্রনাথ মাথা নীচু না করিয়া থাকিতে পারিল না; তাহার মর্ম্মের অস্থিগুলা পর্য্যন্ত কে যেন কাঁটা দিয়া বিঁধিতে লাগিল। মনোরমা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করিল। দেবেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষেত্রনাথের সাহস হইল না। সে নতমুখেই

উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং উভয়কে নমস্কার করিয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মনোরমা পাড়বার ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতে ক্ষেত্রনাথ সহসা সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনোরমা কিন্তু কিছু বলিল না। ক্ষেত্রনাথ একটু দাড়াইয়া থাকিয়া লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি আমাকে ক্ষমা কত্তে পারেন না?"

রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "কিছুতেই না। যে ধর্ম্ম পরিত্যাগ কত্তে পারে, তাকে ক্ষমা করবার সহিষ্ণুতা খুব কম লোকেরই থাকে।"

ক্ষেত্রনাথ নীচু মাথাটা উচু করিয়া তুলিয়া, সতৃষ্ণ দৃষ্টিটা মনোরমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "যার জন্য জীবন ত্যাগ করা যায়, তার জন্য ধর্ম্মত্যাগ করা খুব সহজ নয় কি?"

মনোরমার সর্ব্বশরীর যেন বিদ্যুৎপ্রবাহে কাঁপিয়া উঠিল। সে দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া, রক্তবর্ণ মুখখানা তুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "জীবন আর ধর্ম্ম এ দুইটা কি আপনার দৃষ্টিতে সমান?"

ক্ষেত্রনাথ কোন উত্তর করিতে পারিল না; মনোরমার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রশ্নসূচক দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মস্তক নত হইয়া পড়িল। মনোরমা বলিল, "আপনার ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাই না, কিন্তু আমার সঙ্কল্প জেনে রাখুন, আমি আজীবন বিবাহ করবো না।"

ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে ক্ষেত্রনাথের মুগ্ধ চেতনাটাকে সজাগ করিয়া দিয়া মনোরমা ঘরের ভিতর ঢুকিল। ক্ষেত্রনাথ মাথা নীচু করিয়াই বাহিরে চলিয়া আসিল।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত

বাড়ীতে আসিয়া ক্ষেত্রনাথ ডাকিল, "জেঠাইমা।"

রন্ধনশালা হইতে দুর্গাদেবী উত্তর দিলেন। ক্ষেত্রনাথ রান্নাঘরের দরজার বাহিরে দাড়াইয়া বলিল, "আজ আমি কিছু খাব না জেঠাইমা, আমার আজ উপোষ।"

দুর্গাদেবী ব্যস্তভাবে দরজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "কেন রে, কোন অসুখ বিসুখ—"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "অসুখ বিসুখ নয়, আমাকে একটা প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে। আজ উপোষ দিয়ে সংযত হ'য়ে থাকা দরকার।"

অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দুর্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের প্রায়শ্চিত্ত রে!"

মুখ ভারী করিয়া একটু বিরক্তির সহিত ক্ষেত্রনাথ বলিল, "কিসের প্রায়শ্চিত্ত তা জান না বুঝি। এই যে পনরো দিন হাসপাতালের ভাত খেয়ে এলাম, তার একটা প্রায়শ্চিত্ত না করলে চলে।"

দুর্গাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা। তা ওর তরে বুঝি উপোষ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে। বলে—কত লোক কত কি খেয়ে আসচে। ক'টা লোক প্রায়শ্চিত্ত কচ্চে রে!"

মাথা নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "যে না করে করুক, আমি কিন্তু তা পারব না। হিঁদুর ছেলে, বামুনের ছেলে, যার তার হাতে খেয়ে চুপ ক'রে থাকব?"

ঈষৎ রাগতভাবে দুর্গাদেবী বলিলেন, "না, মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবি। ধন্যি ছেলে, যা হোক, দু'দিন হাঁসপাতালে খেয়েচে, অমনি চললো উপোষ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে।"

ব্রজসুন্দরী অদূরে বসিয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি মধ্যস্থ ভাবে বলিলেন, "তা খেতু এমন মন্দই বা কি বলচে দিদি, হিঁদুর ঘরে হিঁদু আচরণে না থাকলে চলবে কেন।"

পৃষ্ঠপোষক পাইয়া খেতু তখন আরও জোর করিয়া বলিল, "এই বল তো মাসীমা, যদি আচার ব্যাভারই ছাড়লাম, তবে আর রইলো কি। ধর, হাঁসপাতালের ভাত খেয়েছি, বেহ্মজ্ঞানীদের ঘরে জল খেয়েছি, চা বিস্কুটগুলো গিলেছি। এতে প্রায়শ্চিত্ত না করলে চলে? গা যে নিস্ পিস্ কত্তে থাকে।"

মাথা নাড়িয়া ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "ঠিক কথাই তো।"

ধমক দিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "তুই থাম্ ছোট বৌ, তোর আর মধ্যস্থি কত্তে হবে না। ও সারা দিনরাত উপোষ দিয়ে কাল প্রায়শ্চিত্ত করবে, তুই খেপেছিস্ আর কি। খেতে একটু বেলা হ'লে মুখ দিয়ে কথা বের হয় না, ও দেবে উপোষ। কপাল আমার!"

ক্ষেত্রনাথ মাথা খাড়া করিয়া সদম্ভে বলিল, "কি, আমি উপোষ দিতে পারব না? আচ্ছা দেখ পারি কি না। আমি গঙ্গা নাইতে চললাম, অমনি মাথাটা মুড়িয়ে আসব।"

ক্ষেত্রনাথ প্রস্থানোদ্যত হইল। দুর্গাদেবী বলিলেন, "ওরে শোন্।"

ক্ষেত্রনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল। দুর্গাদেবী বলিলেন, "তা প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয় করবি। উপোস দেবার দরকার নাই।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "তাও কি হয়, উপোস দেওয়া যে নিয়ম।"

ঝঙ্কার দিয়া দুর্গাদেবী বলিলেন, "নিয়মও আছে, নিয়মের বিধানও আছে। কাল দু'গণ্ডা পয়সা উচ্ছুগ্যু ক'রে দিলেই হবে। হয় নয় পুরুত মশায়কে জিগ্যেস করবি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "জিজ্ঞাসার দরকার নাই, আমিও তা জানি জেঠাইমা, কিন্তু সেটা আতুরে। আমি তো আতুর নই। আর প্রায়শ্চিত্তের মানেই হচ্ছে শরীরকে কষ্ট দেওয়া। না জেঠাইমা, উপোষ আমাকে দিতেই হবে। না হ'লে মনের প্রতীতি হবে না।"

"এমন একগুঁয়ে ছেলেও দেখি না বাবা" বলিয়া দুর্গাদেবী স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ গঙ্গাস্নানে চলিল

পরদিন প্রায়শ্চিত্তান্তে খানিকটা চিনির সরবৎ গলায় ঢালিয়া দিয়া আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আঃ, বাঁচলাম জেঠাই মা, দেহ মন দুই ঠাণ্ডা হ'লো। বামুনের ছেলে, শুদ্ধ আচারে না থাকলে কিছু ভাল লাগে না।"

দুর্গাদেবী সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু আবার তো ও বেলাই চা বিস্কুট গিলতে যাবি।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া ক্ষেত্রনাথ উত্তর করিল, "আবার, নেড়া দু'বার বেলতলায় যায় না জেঠাই মা। ইঃ, চা বিস্কুটগুলোর কথা মনে হ'লে এখনো যেন বমি আসে।"

অপরাহ্নে মুণ্ডিত মস্তক এবং শান্ত চিত্ত লইয়া ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে আপনার হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন মানসে দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া যখন শুনিল যে, পূর্ব্বদিন রাত্রির ট্রেনে মনোরমা পিতার সহিত পশ্চিম যাত্রা করিয়াছে, তখন সে দরজার সম্মুখে বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িল।

অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রোগশয্যায়

ঘোষাল মহাশয়ের অসুখটা যে খুব বেশী হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু তিনি সেই সামান্য অসুখটাকেই এত বড় করিয়া ভাবিয়া লইলেন যে, তাহাতে শুধু তিনি নহেন, অন্যান্য সকলেও বুঝিয়া লইল, তাঁহার মহাযাত্রার সময় উপস্থিত। শুধু কবিরাজ সর্ব্বানন্দ রায় বুঝিলেন যে, সে যাত্রার জন্য বৃদ্ধের যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও আপাতত তাহা পূর্ণ হইবার তেমন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

প্রথমে দিন কতক জ্বর, তারপর অরুচি, অরুচির পর অজীর্ণ রোগের লক্ষণ দেখা দিল। ঘোষাল মহাশয় বধূকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আর দেখ কি বৌমা, এ সব চিত্রগুপ্তের পেয়াদা। মেয়াদ ফুরিয়েছে, এখন তোমাকে কোথায় ফেলে যাব তাই আমার প্রধান ভাবনা।"

রমা কাঁদা কাটা করিয়া ঔষধ খাইবার জন্য শ্বশুরকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় ডাক্তারী ঔষধ খাইতে রাজী হইলেন না। শেষে রমার অনেক পীড়াপীড়িতে কবিরাজী ঔষধ খাইতে লাগিলেন। কিন্তু ঔষধ সেবনে যে আরোগ্য লাভ করিবেন এ বিশ্বাস তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং সময় থাকিতে দেনা পাওনা ও জমি জায়গার বন্দোবস্ত শেষ করিয়া ফেলিতে ব্যস্ত হইলেন। খাতকদের ডাকাইয়া সুদ আসলের হিসাব করিলেন; যাহাদের কাছে দুই চারিটাকা পাওনা ছিল, তাহাদের রেহাই দিলেন, যাহাদের কাছে পাওনা বেশী তাহাদিগকে সময় দিলেন। জমি জায়গার কোন্ গুলা দামোদরের নামে

দেওয়া উচিত তাহা একখানা কাগজে চিহ্নিত করিতে লাগিলেন। বন্ধকী জিনিষপত্র রমাকে বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দীর্ঘ প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বে সংসারের বন্দোবস্তের জন্য লোকে যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়ে, ঘোসাল মহাশয় অনন্তযাত্রার পূর্ব্বে তদধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকাকে একখানা চিঠী দেব বৌমা ?"

রুদ্ধ অভিমানের স্বরে রমা বলিল, "তাকে চিঠী দিয়ে কি হবে বাবা ?"

ঈষৎ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কিছু না হ'লেও খবরটা দিতে দোষ কি। আর আমার মান অভিমানের সময় নাই তো বৌমা, এ যে যাবার সময়। তোমারও আর অভিমান করলে চলবে না বাছা, আর কার উপর অভিমান করবে ?"

বৃদ্ধের গলাটা ভারী, চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিল। রমা মুখে কাপড় চাপা দিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘোষাল মহাশয় তাড়াতাড়ি চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া, মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিলেন, "আঃ, তোমাদের ঐ এক দোষ, একটুতেই কেঁদে ফেল। বলি, জগতে চিরস্থায়ী কে বল দেখি ? নিজের এই দেহটাই যখন থাকবে না, তখন অন্যে পরে কা কথা।"

কণ্ঠশব্দে গলাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "যাক, তা হ'লে ছোঁড়াকে চিঠি একখানা দেওয়া যাক। নয় তো তার চিরকাল আক্ষেপ থেকে যাবে, দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা হ'লো না। তোমাকেও এর পর দোষ দেবে। তার চেয়ে খবরটা দিই, তারপর আসে এলো, না আসে না এলো।"

রমা বেশ করিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "তোমার অসুখ শুনলেই সে ছুটে আসবে বাবা।"

সহাস্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আসবে না? তুমি মনে কর বুঝি তার টান নাই, রীতিমত টান আছে। এ মহামায়ার সংসার, সে যাবে কোথায়। যাক্, এসে পড়লে নিমিরও একটা গতি ক'রে যেতে পারি। তুমি কি মনে কর বৌমা জানি না, কিন্তু যদি কায়মনে দামোদরের সেবা ক'রে থাকি, তবে নিমির সঙ্গে খেতার বিয়ে না দিয়ে আমি যাচ্চি না, তা সে যম ছেড়ে যমের বাবা এলেও নিয়ে যেতে পারবে না। জ্ঞানতঃ কখন মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয় নি, আর মরবার আগে এত বড় একটা কথা মিথ্যা হ'য়ে যাবে? তুমি পাগল হ'য়েছ বৌমা।"

বধূর মুখের দিকে চাহিয়া ঘোষাল মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া রমা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আজই চিঠিখানা লিখে দিই। বিয়ে হোক না হোক, শেষ দেখটাও তো হবে। কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, মুখে এক মুড়ো আগুনও তো দিতে পারবে।"

রমা চোখে আঁচল চাপা দিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। অনেক মুসাবিদা, অনেক কাটাকুটি করিয়া তিনি যে পত্রখানা লিখিলেন, তাহা যে বেশ মোলায়েম হইল, এমন বলা যায় না, এবং মান অভিমান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেও পত্রের প্রতি কথায় সেইটাই সব চেয়ে বেশী ফুটিয়া উঠিল।

পত্র দিবার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তথাপি কি ক্ষেত্রনাথ, কি তাহার পত্র কিছুই যখন আসিল না, তখন মানসিক অধীরতার সহিত রোগযাতনা এত বাড়িয়া উঠিল যে, ঘোষাল মহাশয় শয্যা গ্রহণ

করিলেন। শুধু শয্যার আশ্রয় লইলেন না, কবিরাজকে গালাগালি দিয়া তাড়াইলেন, ঔষধের বড়ীগুলা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিলেন, সুপথ্য ত্যাগ করিয়া কুপথ্য দিবার জন্য রমাকে আদেশ করিতে লাগিলেন। রমা কিন্তু সে আদেশ পালন করিতে পারিল না; সুতরাং তাহাকেও অনেক গালি খাইতে হইল।

ঘোষাল মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই ঘরের ভিতর পড়িয়া থাকিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না; কেহ কথা কহিলে বা কাছে গেলে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। শুধু একজন কাছে গেলে বিরক্ত হইতেন না। সে নিমি। দাদা মশায়ের অসুখ শুনিয়া নিমি প্রায় দুই বেলা তাঁহাকে দেখিতে আসিত, এবং সমস্ত বেলা তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইত। সেই সময়টুকু যেন ঘোষাল মহাশয়কে একটু প্রফুল্ল দেখা যাইত। যতক্ষণ নিমি থাকিত, ততক্ষণ যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিত, কিন্তু নিমি চলিয়া গেলেই তাঁহার মেজাজ আবার সপ্তমে চড়িত। নিমির প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা অব্যক্ত যাতনা আসিয়া তাঁহার বুকটা চাপিয়া ধরিত।

হায়! মৃত্যু—মৃত্যুর পথও এমন কণ্টকাকীর্ণ, এত যন্ত্রণাময়! দামোদর! সারা জীবনটা কাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েছে, এখন এই মৃত্যুর পথটাকে একটু সহজ শান্তিময় ক'রে দাও দয়াময়। কে নিমি, কে শ্বেতা; একমাত্র তুমিই আপন, বন্ধু, সুহৃৎ, আর সব ভুল, এই বিশ্বাসটুকু প্রাণে দৃঢ় ক'রে দাও।

প্রার্থনা নিষ্ফল হইল; শ্বেতা ও নিমি মনের দুই পাশে দাঁড়াইয়া খল খল হাসিতে থাকিল। বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাহিরে ভিখারী গাহিয়া উঠিল,—

"এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নি মা তোর মনের মত।
অকৃতী সন্তানে মাগো যন্ত্রণা আর দিবি কত॥"

রমা আসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

তাড়াতাড়ি চাদরে মুখ ঢাকিয়া ঘোষাল মহাশয় পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রমা বলিল, "নিমির মা এসেছেন।"

ঘোষাল মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কেন?"

নিমির মা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া খুব মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর পো কল্যাণপুর হ'তে একটী সম্বন্ধ এনেছে।"

ঘোষাল মহাশয় উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

নিমির মা। বলছে ছেলেটী মন্দ নয়, একটু লেখাপড়া জানে, বয়স বছর পঁচিশ। মা বাপ নাই, জমি জায়গা আছে; শ তিনেক টাকা আর—

ঘোষাল মহাশয় ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং বালিশের উপর সজোরে একটা চাপড় মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "কে তাঁকে এত খোঁজ নিতে ব'লেছিল।"

নিমির মা ভীতভাবে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। ঘোষাল মহাশয় মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপ মা নাই, পঁচিশ বছরের বুড়ো, তার উপর তিন শো টাকা—ভা-রী-ই সম্বন্ধ এনেছে।"

ঘোষাল মহাশয় পুনরায় শুইয়া পড়িলেন, এবং দরজার দিকে মুখ করিয়া ভারী গলায় বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে দিতে পার। আমার টাকা দেবার কথা টাকা দেব, ইচ্ছা হয় এখনি নিয়ে যাও। তারপর তোমার মেয়ে, তাকে তুমি জলে ফেল, আগুনে ফেল, আমার তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

নিমির মা ঘোষাল মহাশয়ের ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সরিয়া গেলেন। ঘোষাল মহাশয় তখন বধূকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "লোকের কি আক্কেল দেখ, আমি নিজের জ্বালায় অস্থির, ম'ত্তে বসেছি, আর আমি গিয়ে ওর মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে দেব। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।"

রমা কোন উত্তর করিল না, শুধু মনে মনে মৃদু হাসিল।

পর দিন কিন্তু ঘোষাল মহাশয় নিমির মাকে ডাকাইয়া বেশ সহজ শান্ত ভাবে বলিলেন, "সম্বন্ধটা যখন এসেছে বৌমা, তখন সেটা হাতছাড়া করা ভাল নয়। মাসও তো শেষ হ'য়ে এল, মাসের আর সাতটা দিন মাত্র বাকী। যদি ঘর বর ভাল হয়, তা হ'লে দিয়ে ফেল। শুভস্য শীঘ্রং।"

নিমির মা কপাটের পাশ হইতে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "সে হবে, আপনি আগে সেরে উঠুন।"

ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পাগল হ'য়েছ বৌমা, তোমরা কি মনে কর, আমি আবার সেরে উঠবো? সে আশা আর ক'রো না, এই আমার শেষ। আমিও দামোদরের কাছে প্রার্থনা কচ্চি, আর যেন আমাকে না উঠতে হয়। উঠে কি করবো বৌমা, শুধু দাগা পাওয়া বৈ তো না। না বৌমা, সে প্রার্থনা আর তোমরা ক'রো না, এখন তোমরা ভগবানকে শুধু এই জানাও, যেন শীগগির এই দাগাদার সংসারের হাত এড়িয়ে যেতে পারি।"

বেদনার দীর্ঘশ্বাসে বৃদ্ধের বুকটা জোরে কাঁপিয়া উঠিল। নিমির মা নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ঘোষাল মহাশয় একটু থামিয়া বলিলেন, "না বৌমা, আর দেরী ক'রে কাজ নাই। মেয়ে ক্রমেই ডাগর হ'য়ে উঠচে, আর রাখা ভাল দেখায় না। বলরাম কি বলচে, ঘর বর ভাল?"

নিমির মা বলিলেন, "বলচে তো তাই।"

একটু জোর গলায় ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "শুধু বললেই তো হবে না, তার সন্ধান নিতে হবে, গোপনে জানতে হবে। যে সে কাজ নয়, মেয়ে দেওয়া। আচ্ছা, তুমি বলরামকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কল্যাণপুরের সকলকেই তো জানি, কার ছেলে? আচ্ছা, সে শুনলেই বুঝতে পারবো। তা হ'লে পাঠিয়ে দিও, বুঝলে?"

নিমির মা স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অপরাহ্ণে ঘোষাল মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়াছিলেন. সহসা মস্তকে কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে?"

নিমি পাশে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘোষাল মহাশয় উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "এই যে নিমাই মণি।"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "এত তন্ময় হ'য়ে কি ভাবছিলে দাদামশায়?"

"ভাবছিলাম তোরি কথা।"

"ওটা তোমার নেহাৎ কথার কথা। আমি জানি, তুমি কার কথা ভাবছিলে।"

"কার কথা, বল্ দেখি।"

দাদামশায়ের মুখের উপর মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া নিমি বলিল, "আমি তা বলতে যাব কেন?"

ঘোষাল মহাশয়ের শুষ্ক ওষ্ঠেও মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। তিনি সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু সত্যি বলছি নিমাইমণি, সেই সঙ্গে তোর কথাও ভাবছিলাম

পাশে বসিয়া নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা কি ভাবছিলে দাদামশায়?"

"ভাবছিলাম, তোর তো বিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু তারপর এ

বুড়োর কি গতি হবে? এমনি পাশে ব'সে কে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, কার সঙ্গেই বা গল্প করবো।"

"এতই যদি ভাবনা, তবে বিয়েটা না হয় বন্ধই রাখ না?"

"তা যে হয় না নিমাইমণি।"

"খুব হয়।"

ঘোষাল মহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন, কথার সঙ্গে সঙ্গে নিমির মুখের উপর দিয়া যেন একটা সলজ্জ দৃঢ়তার রক্তিমা চমকিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি ভাবচো দাদামশায়?"

চোখ মেলিয়া গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ভাবচি 'মানুষ গড়ে বিধাতা ভাঙ্গে।' বুঝলি?"

নিমি হাসিয়া বলিল, "একটুও বুঝলাম না।"

শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি তো তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সে ছোঁড়া যে—উঃ, ভারী নিমকহারাম নিমি, ভারী নিমকহারাম। কি বলবো, যদি একবার তাকে হাতের কাছে পাই।"

সহাস্যে নিমি বলিল, "তা হ'লে দু'চার ঘা বসিয়ে দাও, কেমন না?"

রাগে ভ্রূকুটী করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "দু'চার ঘা? উঁহুঃ, আমার এমনি ইচ্ছা হচ্চে নিমি, একবার দেখা পেলে তাকে এমন শিক্ষা দিই যে, সে বুঝতে পারে বুড়ো লোকটা কি রকম। পাজী, হতভাগা, নিমকহারাম।"

নিমি বলিল, "আচ্ছা দাদামশায়, তুমি গাল দিচ্চ, আর এই সময়ে যদি সে এসে পড়ে?"

ঘোষাল মহাশয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং দুই হাতে নিমির একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলিলেন, "এ্যাঁ, এই সময় ? সত্যি এসে পড়বে ?"

নিমি হাসিয়া উঠিল। ঘোষাল মহাশয় আপনার আকস্মিক উত্তেজনায় আপনিই লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলেন। নিমি পাখাখানা লইয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

খানিকটা চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া ঘোষাল মহাশয় ডাকিলেন, "নিমি !"

"কেন দাদামশায় ?"

"একটু তামাক দিতে পারিস্ ?"

"খুব পারি।"

"তবে দে দিদি, অনেকদিন তামাক খাই নি।"

নিমি হুঁকা কলিকা তামাকের অন্বেষণ করিয়া তামাক সাজিয়া আনিল। ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া বসিলেন, এবং নিমির হাত হইতে হুঁকা লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "২৭শে একটা দিন আছে, আজ ২২শে। মাঝে পাঁচটা—পাঁচটা কেন চারটে দিন। এই দিন চারটে কিন্তু দিদি, তুই বুড়োকে ছেড়ে যাস্ না।"

বৃদ্ধের স্বরটা যেন উদ্‌গত বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিল। ম্লান হাসি হাসিয়া নিমি বলিল, "শুধু চারটে দিন !"

"তার বেশী আর যে রাখতে পারি না দিদি।"

মুখ নীচু করিয়া গভীর বেদনাজড়িত কণ্ঠে মৃদু স্বরে নিমি বলিল, "সত্যি পার না ?"

তাহার বেদনাকাতর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ঘোষাল মহাশয়

ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "পারি, কিন্তু না নিমাই, বিশ্বাস হয় না। সব চলে, কিন্তু মেয়ে মানুষের বিয়ে না হ'লে চলে না।"

ঘোষাল মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকাটা মুখের কাছে আনিলেন। নিমি নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হুঁকায় একটা টান দিয়া ঘোষাল মহাশয় স্নেহসজলকণ্ঠে ডাকিলেন, "নিমি।"

নিমি জলভরা চোখ দুইটা তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। চাহিতেই তাহার চোখের কোণ বাহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় পাশের জানালায় হুঁকাটা রাখিয়া নির্জ্জীবভাবে শুইয়া পড়িলেন।

ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ধার শোধ

ঘোষালমহাশয়ের সম্মতি পাইয়া বলরামের উপস্থাপিত সম্বন্ধেই নিমির মাকে মত দিতে হইয়াছিল। সেদিন বৈকালে বরপক্ষের মেয়ে দেখিতে আসিবার কথা। বলরাম বলিয়াছিলেন, "মেয়ে পছন্দ হ'লে তাঁরা একেবারে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন।" নিমির মা আশান্বিত হইয়া ভদ্রলোকদিগের উপস্থিতির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈকালে তিনি মেয়ের একটু সাজগোজ করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। নিমি কিন্তু গোল বাধাইল, সে কিছুতেই সাজগোজ করিতে রাজি হইল না, রাগিয়া বলিল, "রোজ রোজ এক রঙ্গ শিখেছ। কেন, আমি কি যে, রোজ রোজ সেজেগুজে যাকে তাকে দেখা দিতে হ'বে?"

বলিয়া নিমি ব্যস্ত হস্তে বাঁধা খোঁপা খুলিয়া ফেলিল। মা ইহাতে ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন। তিনি মেয়েকে তিরস্কার করিলেন, তাহার পোড়া কপালকে ধিক্কার দিলেন। নিমিও মাকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল। মাতা তখন অসহিষ্ণুভাবে কন্যার পৃষ্ঠে একটা চড় বসাইয়া দিলেন। নিমি কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাটীর বাহির হইল, এবং মুক্ত কেশ, রক্ত চক্ষু, বিস্রস্ত বেশ লইয়া ঘোষালমহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ঘোষালমহাশয় বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি নিমাই?"

নিমির রাগ তখনও যায় নাই। সে চোখ কপালে তুলিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া, ঘাড় দোলাইয়া রোষ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা দাদামশাই,

রোজ রোজ যে আমাকে সেজেগুজে যার তার সামনে বেরুতে হবে, কেন, আমি এমন কি ক'রেছি যে—"

নিমি আর বলিতে পারিল না, সে ফুলিতে ফুলিতে দুই হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিল। ঘোষালমহাশয় শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া স্তব্ধ নিস্পন্দ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চহিয়া রহিলেন। রমা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে?"

নিমি ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘোষালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকে দেখতে এসেছে বুঝি?"

চোখ হইতে হাত না সরাইয়া নিমি উত্তর দিল, "আসবে।"

মৃদু হাসিয়া রমা বলিল, "এরি তরে কান্না! তা দেখতে এলেই বা?"

নিমি ফুলিতে ফুলিতে উত্তর করিল, "রোজ রোজ দেখতে আসবে, আর রোজ আমাকে সেজেগুজে যার তার সামনে—কেন আমি এমন কি—"

ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে নিমি কথা শেষ করিতে পারিল না। ঘোষালমহাশয় বলিলেন, "এত কাঁদছিস্ কেন? মা বুঝি গাল বকুনি দিয়েছে?"

নিমি বলিল, 'হাঁ, শুধু গাল বকুনি বৈকি।"

ঈষৎ হাসিয়া ঘোষালমহাশয় বলিলেন, "মেরেছে? আচ্ছা, চল্ তো দেখি, সে বেটীর গায়ে কত জোর হ'য়েছে। দাও তো বৌমা লাঠীটা।"

রমা বলিল, "তুমি যেতে পারবে বাবা?"

ঘোষালমহাশয় কাপড়টা গুছাইয়া লইতে লইতে বলিলেন, "দেখি, লাঠী ধ'রে আস্তে আস্তে যাই। তা নৈলে দেখছো তো।"

নিমি মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কিন্তু কিছুতেই যাব না।"

ঘোষা। তুই না গেলে চলবে কেন দিদি, তারা তো আমাকে দেখতে আসছে না, তোকেই দেখতে আসছে।

নিমি। সে তাদের গরজ, আমার কি।

ঘোষা। শুধু তাদের গরজ নয়, তোরও যে একটু গরজ আছে। তোরি যে বিয়ে।

নিমি। বিয়েই হোক আর যাই হোক, আমি আর কারো সামনে বের হব না, এই আমার পণ।

বলিয়া নিমি সকরুণ দৃষ্টিতে রমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা মাসীমা, তুমিই বল দেখি,—"

কথা শেষ না করিয়াই নিমি ঘাড় হেঁট করিল। রমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতে করিতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাকিল, "নিমি!"

নিমি একবার চোখ তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল। তারপর সহসা রমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিল। তাহার চোখের জলে রমার বুক ভিজিয়া যাইতে লাগিল। রমা কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিমির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর শ্বশুরের দিকে ফিরিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল, "নিমি ঠিক কথাই ব'লেছে বাবা, ঘোষালদের বাড়ীর বৌ যার তার সামনে যেতে পারে না।"

ঘোষাল মহাশয়ের বুকের উপর যেন মুগুরের ঘা পড়িল। সে আঘাতে তিনি যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, এমনই উচ্চ আহত কণ্ঠে ডাকিলেন, "বৌমা!"

রমা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তুমি যখন দামোদর সাক্ষী ক'রে ওকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছ, তখন ও আমাদেরি বৌ, বিয়ের মন্ত্র পড়া হোক্ চাই না হোক্।"

ঘোষাল মহাশয় নিস্পন্দ দৃষ্টিতে রমার কঠিন মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। রমা ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছে, নিশ্বাসটা খুব জোর বহিতেছে, চোখ দু'টা যেন কপালে ঠেলিয়া উঠিতেছে। রমা তাড়াতাড়ি তাঁহার চোখে মুখে জলের ছাট দিল, নিমি মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে ঘোষাল মহাশয় যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। রমা ডাকিল, "বাবা!"

তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘোষাল মহাশয় পুনরায় চক্ষু নিমীলিত করিলেন। নিমিকে বাতাস করিতে বলিয়া রমা বাহিরে গেল; উদ্দেশ্য, প্রতিবেশীদের কাহাকেও ডাক্তার ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু সদর দরজার বাহিরে পা দিবা মাত্রই কে ডাকিল, "পিসীমা!"

সে পরিচিত ডাকে রমা চমকিয়া উঠিল; সে চকিতা হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইল, হাতে জুতা, বগলে ছাতা, হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ভরা মূর্ত্তি লইয়া ক্ষেত্রনাথ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

রমা উদ্বেল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুই এলি রে খেতা?"

হাতের জুতাটা মাটীতে ফেলিয়া ছাতার আগা দিয়া পায়ের কাদা মুছিতে মুছিতে ক্ষেত্রনাথ বলিল, "এলাম বৈকি পিসীমা, না এসে থাকতে পারলাম কৈ। কিন্তু কি কাদা! বাপ্, মাথায় থাক্ আমার জননী জন্মভূমিশ্চ।"

তারপর পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় এত হন্তদন্ত হয়ে তুমি কোথায় চলেছ?"

রমা ব্যাকুলস্বরে বলিল, "যাচ্চি ডাক্তার ডাকবার লোক দেখতে। বাবা বুঝি বাঁচেনা খেতা।"

রমার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ক্ষেত্রনাথ ব্যস্তভাবে বলিল, "বাহবা, তবে আমি এই বিশ কোশ পথ থেকে ছুটে এলাম বুড়োকে পোড়াবার তরে নাকি। তুমি পাগল হ'য়েছ পিসীমা।"

রমা বলিল, "না খেতা, সত্যিই বাবার বড় অসুখ।"

"হলেই বা অসুখ। অসুখ হ'লেই বুঝি লোকে বাঁচে না? চল চল, অসুখটা কি রকম দেখি।"

রমাকে ঠেলিয়া ক্ষেত্রনাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, রমা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ী ঢুকিল।

ক্ষেত্রনাথ তিন লাফে উঠান পার হইয়া ঘরের দাবায় উঠিল, এবং চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দাদামশায়!"

ঘোষাল মহাশয় তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন; ডাক শুনিয়া যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় তাড়াতাড়ি মাথাটা উচু করিলেন। ক্ষেত্রনাথ একলাফে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ব্যাপারটা কি দাদামশায়, আমি ছুটাছুটী ক'রে আসছি, আর তুমি মস্তে বসেছ! খুব তোমার আক্কেল তো?"

ঘোষাল মহাশয় মাথাটা বালিশের উপর রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ক্ষেত্রনাথ জোর গলায় বলিতে লাগিল, "ও সব মরাটরা রেখে দাও, আমি যখন এসেছি তখন তোমাকে বাঁচতেই হবে।"

বালিশ হইতে মাথাটা তুলিয়া ভারী গলায় ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কেন গা বাবু, আমি তোমার বাবার চাকর নাকি যে, আমার উপর হুকুম চালাতে এসেছ?"

মাথা নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "আমিই বুঝি তোমার চাকর, যে

তোমার তরে এই বর্ষায় বিশ ক্রোশ পথ ভেঙ্গে ছুটে আসছি? এখন উঠবে কিনা বল। ধর তো নিমি, বুড়োর মাথাটা, আমি হাত দু'টো ধরি।"

নিমি মুখ ফিরাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘোষাল মহাশয় ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন, এবং সহাস্য তর্জ্জনে বলিলেন, "রক্ষে কর্ খেতা, বুড়োর উপর যে জোর দেখিয়েছিস্ তাই যথেষ্ট, আর বেশী জোর দেখাতে হবে না।" তারপর রমার দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন, "দেখচো বৌমা, জোর দেখেছ, বলে মরা হবে না। মরণ এলে ও যেন ধরে রাখবে।"

রমা মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিল। ক্ষেত্রনাথ হাতে হাত চাপড়াইয়া বলিল, "আলবৎ ধরে রাখবো। কৈ মর দেখি এবার।"

আহ্লাদে থল্ থল্ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "সত্যিই বৌমা, এ যাত্রা বুঝি মরা হ'লো না। আমি জানি, ও ছোঁড়া এলেই একটা না একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। যাক্, সকলই তাঁর ইচ্ছা।"

ক্ষেত্রনাথ জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "ইচ্ছা যে তাঁর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই দাদামশায়। তা নইলে আমি এত ছুটাছুটী ক'রে শেষে আবার তোমার অধীন হ'তে আসি? দেখছি, সংসারে স্বাধীন হ'বার যো নাই।"

গম্ভীর হাসি হাসিতে হাসিতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "যো থাকবে কোথা হ'তে? সংসারটাই যে মহামায়ার অধীন। পালাবার কি যো আছে? কি বলগো বৌমা, তা নৈলে নিমির বিয়ে দিয়ে কোন্ দিন তো কাশী পালিয়ে যেতাম।"

রমা হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "আর কারো পালিয়ে কাজ নাই বাবা, এখন ওদের চার হাত এক ক'রে দাও।"

মাথা নাড়া দিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "পাগল হ'য়েছ বৌমা, চার হাত এক খেতার সঙ্গে? ওতো বেহ্ম, ওর কি জাত আছে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া উত্তর করিল, "জাত রীতিমত আছে দাদামশায়, যায় যায় হ'য়েছিল বটে, কিন্তু এই দেখ, মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে এসেছি।"

ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠিক হ'য়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আমার নিমাইমণিকে তুচ্ছ ক'রে সেই বেহ্ম মেয়েটার সুখ্যাতি! ঠিক হ'য়েছে, কি বলিস্ নিমাই?"

নিমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নিমির মা উঠান হইতে উগ্রকণ্ঠে ডাকিলেন, "নিমি!"

ঘোষাল মহাশয় দরজার দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাস্যপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "কে, বৌমা এসেছ? দেখ বৌমা, তোমাকে আমি তিন শো বার আবাগের বেটী না ব'লে ছাড়বো না। রামতারণ ঘোষালের নাত-বৌ, তার গায়ে তুমি হাত তোল?"

তার পর রমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাওনা গো বৌমা, আবাগের বেটীকে বুঝিয়ে দাও না, কাজটা কত বড় অন্যায় হ'য়েছে।"

ঘোষাল মহাশয়ের কথায় নিমির মা সলজ্জ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। রমা হাসিতে হাসিতে গিয়া তাঁহাকে টানিয়া দাবার উপর আনিল।

ক্ষেত্রনাথ গিয়া মাসীমার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

হর্ষবিহ্বল কণ্ঠে নিমির মা বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা, খেতু এসেছিস্ ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "এলাম বৈকি মাসীমা, তোমার সেই ঘটী বাঁধা দেওয়া আট গণ্ডা পয়সা যে শোধ করা হয় নি।"

রমা হাসিয়া বলিল, "তাই শোধ দিতেই বুঝি এসেছিস্ ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিল, "হাঁ, তবে আমার তো পয়সা কড়ি নাই, আট গণ্ডা পয়সার বদলে নিমিটার ভার নিলে যদি শোধ যায়।"

কৃত্রিম রোষগম্ভীর স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কি, আমার নিমাইমণির বদলে আট গণ্ডা পয়সা। জানিস্ খেতা, এখনো কল্যাণপুরের আকুলীরা চলে যায় নি ?"

তারপর নিমির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আয় তো নিমাই, দেখি তারা কত দাম বলে।"

বলিয়া তিনি নিমিকে ধরিতে গেলেন। নিমি কিন্তু ধরা দিল না, সে মুখে কাপড় চাপা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। ঘোষাল মহাশয় "ধর্ ধর্" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নিমি ছুটিয়া পলাইল। সমবেত কণ্ঠের উৎফুল্ল হাস্যধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হইল।

সমাপ্ত